ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে সুশাসনঃ চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

মো. শাহ্নূর রহমান

নাজমুল হুদা মিনা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (৪র্থ ও ৫ম তলা), বাড়ি নং ০৫, সড়ক নং ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯

ফোন: ৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২ ফ্যাক্স: ৯১২৪৯১৫

ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org, ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে সুশাসন: চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ার, ট্রাস্টি বোর্ড, টিআইবি

এম. হাফিজউদ্দীন খান
সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ড, টিআইবি

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগ, টিআইবি

গবেষণা তত্ত্বাবধান

মো. ওয়াহিদ আলম
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগ, টিআইবি

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

মো. শাহ্নূর রহমান
প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগ, টিআইবি

নাজমুল হুদা মিনা
অ্যাসিস্টেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগ, টিআইবি

গবেষণা সহযোগী

মো.সামিউর রহমান
গবেষণা সহকারি (প্রাক্তন) -রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগ, টিআইবি

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট অংশিজন- বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল, বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি এবং বাংলাদেশ কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট সমিতির সদস্যবৃন্দ, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মূল্যবান মতামত এই গবেষণা প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও মূল্যবান মতামত প্রদানে টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার ওয়াহিদ আলম এবং শাহজাদা এম আকরামের প্রতি কৃতজ্ঞতা। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে গবেষণা ও অন্যান্য বিভাগের সহকর্মীরা মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন। তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (৪র্থ ও ৫ম তলা)
বাড়ি নং ০৫, সড়ক নং ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২ ফ্যাক্স: ৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org, ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপি দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে টিআইবি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। স্বাস্থ্য খাতে সুশাসন টিআইবির গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমে প্রাধান্যপ্রাপ্ত ক্ষেত্র সমূহের অন্যতম। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ওষুধের বাজার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়।

ওষুধ খাতে বিগত বছরগুলোতে রপ্তানি বৃদ্ধিসহ আমাদের দেশীয় চাহিদা পূরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ভেজাল ও নকল ওষুধ নিয়ন্ত্রণে সাম্প্রতিককালে সরকারিভাবে বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন, মাঠ পর্যায়ে জনবল বৃদ্ধি, ওষুধ পরীক্ষাগার পুনঃস্থাপন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি, ভেজাল ও নকল ওষুধ প্রতিরোধে বিভিন্ন সময়ে অভিযান জোরদারকরণসহ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে এ সকল পদক্ষেপ সত্ত্বেও ওষুধ বাজার নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিতে সুশাসনের ঘাটতি লক্ষণীয়। বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সক্ষমতা এ খাতের ব্যাপক কর্মপরিধি, ভৌগলিক আওতা এবং ওষুধের বাজারের ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ওষুধ নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান আইনি কাঠামো সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথেষ্ট নয় এবং এ ক্ষেত্রে আইনের কার্যকর প্রয়োগেরও ঘাটতি বিদ্যমান। এছাড়া ওষুধ বাজার নিয়ন্ত্রণে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি রয়েছে । অপরদিকে অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন সময়ে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে সদিচ্ছার ঘাটতিও লক্ষ্য করা যায়। এসকল সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার কারণে ওষুধের বাজার তদারকি ও পরিবীক্ষণে অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটিত হয় যা সাধারণ নাগরিকের স্বাস্থ্য ও জীবনের নিরাপত্তায় হুমকি সৃষ্টি করছে।

গবেষণার খসড়া প্রতিবেদনটি ১৪ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও অধিদপ্তরের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়। তাঁদের মূল্যবান মতামতের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি সমৃদ্ধতর হয়েছে। অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ ধরনের সহযোগিতার জন্য তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়া সংশ্লিষ্ট যেসকল অংশীজন তথ্য উপাত্ত দিয়ে গবেষণাটি সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজটি সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক মো. শাহ্নূর রহমান ও নাজমুল হুদা মিনা। এছাড়া টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল ও অন্যান্য ট্রাস্টিগণ এই গবেষণা সম্পন্ন করতে মূল্যবান অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। টিআইবি আশা করে এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য, বিশ্লেষণ ও সুপারিশসমূহ বাংলাদেশে নিরাপদ ও মানসম্মত ওষুধ নিশ্চিতকরণে বিরাজমান সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে এবং ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রশাসন ও তদারকি ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করে তুলতে সাহায্য করবে। সর্বোপরি এ অধিদপ্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের ওষুধ খাত তথা স্বাস্থ্য খাতে অর্জন আরো বাড়ানো সম্ভব হবে।

এ প্রতিবেদনের যে কোনো বিষয়ে পাঠকের মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
অধ্যায় এক: ভূমিকা	১
১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা	১
১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি	৩
১.৩ গবেষণা পদ্ধতি	৪
১.৪ তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা:	৫
১.৫ গবেষণার সময়কাল	৫
১.৬ প্রতিবেদন কাঠামো	৫
অধ্যায় দুই: ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ও সহযোগী অংশীজন	৬
২.১ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যাবলী	৬
২.২ জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো	৬
২.৩ রাজস্ব আয় ও ব্যয়	৭
২.৪ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট কমিটি	৭
২.৫ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সহযোগী অংশীজন	৮
অধ্যায় তিন: ওষুধ নিয়ন্ত্রণে আইনি সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ	১০
৩.১ ওষুধ নিয়ন্ত্রণে আইন ও নীতিসমূহ	১০
৩.২ বাংলাদেশে ওষুধ আইন ও ওষুধ নীতির ক্রমবিকাশ	১০
৩.৩ ওষুধ নিয়ন্ত্রণে আইনসমূহের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ	১১
৩.৪ আইনি সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ	১২
অধ্যায় চার: ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা,সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ	১৬
অধ্যায় পাঁচ: ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতি	২২
৫.১ ওষুধ কোম্পানির গৃহীত সেবা কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন	২২
৫.২ খুচরা ও পাইকারী ওষুধ দোকানের প্রদত্ত সেবা কার্যক্রম অনিয়মের ধরন	২৮
৫.৩ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের তদারকির ঘাটতি ও ওষুধ কোম্পানি কর্তৃক অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন	২৯
৫.৪ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যক্রমে নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ	৩০
অধ্যায় ছয়: উপসংহার ও সুপারিশ	৩১
৬.১ সুপারিশ	৩১
সহায়ক তথ্যসূত্র	
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী	
চিত্রের তালিকা	
১.১ ওষুধ রপ্তানির চিত্র	২
২.১ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের চিত্র (কোটি টাকায়)	৭
৬.১: ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণ	৩১
সারণির তালিকা	
৩.১: ওষুধ আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি ও দণ্ডের শাস্তির পরিমাণ	১৪
২.১ ওষুধ প্রশাসনের জনবল	৭
৫.১: ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যক্রমে নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ	৩০

অধ্যায়: এক
ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

ওষুধ জীবন রক্ষার্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হিসেবে বিবেচিত। স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবেলায় ওষুধের ওপর মানুষের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিরাপদ ও মানসম্মত ওষুধ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে ওষুধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের প্রয়োজনীয় নীতিমালা তৈরী, তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে একটি সংস্থা কাজ করে। বাংলাদেশে এ সংক্রান্ত সকল নিয়ন্ত্রণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হচ্ছে 'ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর'। এ অধিদপ্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্রয়সাধ্যমূল্যে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা এবং তৈরীকৃত ওষুধের উৎপাদনসহ আমদানীকৃত ও রপ্তানিযোগ্য ওষুধসমূহের গুণগত মান ও কার্যকরতা নিশ্চিত করা[১]।

ওষুধ নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক লক্ষ্য হলো জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা, তাই ওষুধ সাধারণ পণ্য হিসেবে বিবেচিত হয় না; বরং এটি মানুষের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করে[২]। সুতরাং বলা যায় ওষুধের একধরনের সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে। এ গুরুত্ব বিবেচনায় কার্যকরভাবে ওষুধ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে দক্ষ মধ্যস্থতাকারী দ্বারা সঠিকভাবে ব্যাবস্থাপত্র প্রদান এবং প্রশিক্ষিত ব্যাক্তি দ্বারা ওষুধ প্রস্তুত ও বিতরণ নিশ্চিত করতে হয়। অপরদিকে ওষুধের বাজার অন্যান্য সাধারণ বাজার ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন। এ বাজার ব্যবস্থায় তথ্যের অসামঞ্জস্যতা এবং একচেটিয়া বাজার আচরণ বিদ্যমান[৩]। এ কারনে প্রতিটি দেশেই ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণ, সুরক্ষা এবং কার্যক্ষমতা নিশ্চিতকরণে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। কিন্তু গত ৫০ বছর ধরে মানুষের এ মৌলিক প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিতে মানসম্পন্ন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গঠনে বিভিন্ন নিয়ম-নীতি সংযুক্ত করা হলেও এখন পর্যন্ত উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে এক্ষেত্রে অনেক সমস্যা বিদ্যমান[৪]। একটি গবেষণায় দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে নকল ইপোটেনিন এবং অ্যাটরোভাসটিন জাতীয় ওষুধ বিদ্যমান এবং এ জাতীয় ওষুধের প্রায় ১ শতাংশ নকল ও ভেজাল[৫] কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে এ অবস্থা আরও ভয়াবহ, যেমন- কম্বোডিয়ার একটি গবেষণায় প্রায় ৬৫ শতাংশ কুইনাইন জাতীয় ওষুধ নকল হিসেবে ধারণা করা হয়[৬] এবং ভারতে ব্যবস্থাপত্রে উল্লেখিত প্রায় ৫০ শতাংশ ওষুধই ভেজাল অথবা নকল[৭]। মূলত উন্নয়নশীল দেশে এ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে দক্ষ এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ব্যবস্থার বিকল্প নেই[৮]।

গত দুই দশকে বাংলাদেশে ওষুধ শিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটেছে এবং এ শিল্পটির ক্রমোন্নতি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে একটি ইতিবাচক প্রভাব রাখছে। বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের পরবর্তীতে এটি একটি সম্ভাবনাময় শিল্প হিসেবে বিবেচিত হয় (গড় প্রবৃদ্ধির হার ২১.৩৯ শতাংশ)। বর্তমানে আমাদের দেশীয় চাহিদার ৯৭ শতাংশ ওষুধ দেশীয় কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদন হচ্ছে[৯] যা জিডিপি'র ১ শতাংশ[১০]। বিশ্ববাজারে ওষুধ রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবদান হচ্ছে বৈশ্বিক মোট রপ্তানির .০১ শতাংশ, যেখানে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত ও সিংগাপুরের অবদান হচ্ছে ১.২ শতাংশ। প্রতিবছর বিদেশে বাংলাদেশী ওষুধের রপ্তানি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে (২০০৩ সালে ওষুধ রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৬৩ কোটি টাকা, ২০১৩ সালে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৬০৩ কোটি টাকায় দাড়িয়েছে)। অপরদিকে ওষুধ শিল্পের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। ২০১৪ সালে ওষুধ শিল্পে সম্ভাব্য ১৫ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

---

[১] ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ২০১৪

[২] http://www.who.int/medicines/library/par/who-2003-9/who_edm_par_20039.pdf. accessed on 24 august 2014

[৩] Hill.S and Johnson.K (2004) "Emerging Challenges and Opportunities in Drug Registration and Regulation in Developing Countries" DFID Health Systems Resources Centre.

[৪] প্রাগুক্ত;৩

[৫] Rudolf PM, Bernstein IBG (2004) "Counterfiet drugs" New Engl J; 350(14): 1384

[৬] Smine A, Phouvong S, Chanthap L, Tsuyoka R, Nivana N(2004). "Antimalarial drug control in Mekong Countries" ICIUM, Thailand

[৭] প্রাগুক্ত;৫

[৮] Fattore G. Jommi C "The new pharmaceutical policy in Italy" Health policy 1998; 46;21-41

[৯] "Input-output sectoral survey report: Pharmaceuticals (Vol 6)" Policy Research Institute(PRI) of Bangladesh, October 2013

[১০] S.K Safwan (2012) "An overview of the pharmaceutical sector in Bangladesh", BRAC EPL

করা হয়েছে[১১]। ওষুধ শিল্প জনগণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে উৎপাদিত ওষুধ এবং এ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে দেশের সার্বিক স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে।

চিত্র: ১.১ ওষুধ রপ্তানির চিত্র[১২]

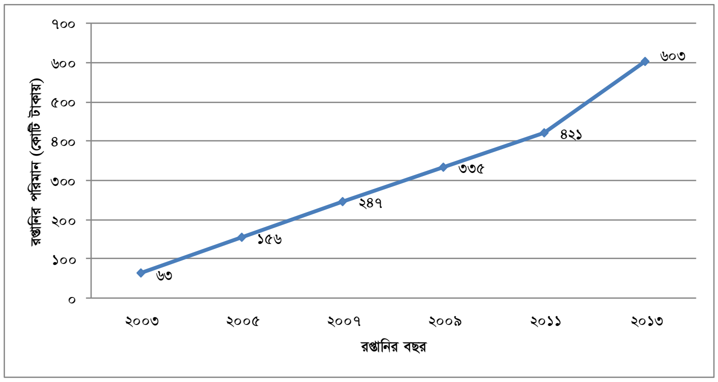

সম্প্রতি ওষুধ খাতের নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দেশে ভেজাল ও নকল ওষুধ নিয়ন্ত্রণে বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলো নিম্নে দেওয়া হল:

- মাঠ পর্যায়ে জনবল বৃদ্ধি ও অবকাঠামো উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ- পরিদপ্তর হতে অধিদপ্তরে উন্নীত হওয়ার পর ৪২ জন ওষুধ তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ, ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের জন্য নতুন ভবন নির্মাণাধীন
- ওষুধ পরীক্ষাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ - ২০১১ সালে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে জাতীয় ওষুধ পরীক্ষাগার পুনঃস্থাপন
- ওয়েবসাইটকে ওয়েব পোর্টালে উন্নীতকরণ এবং বিভিন্ন ধরণের ওষুধের ডাটাবেইজ তৈরি
- বিদ্যমান ওষুধ আইনের সংশোধনীসমূহ সমন্বয় করে যুগোপযোগী ওষুধ আইন, ২০১৪ এর খসড়া প্রণয়ন
- ওষুধের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল পরিচালনা এবং মেডিক্যাল ডিভাইস রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত গাইড লাইনের খসড়া প্রণয়ন
- ভেজাল ও নকল ওষুধ প্রতিরোধে অভিযান পরিচালনা: ২০১৩ সালে মোট ৬৭২টি মামলা দায়ের (ওষুধ আদালত- ১৯, ম্যাজিস্ট্রেট আদালত- ৭, মোবাইল কোর্ট- ৬৪৬)
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ- ৪১টি কোম্পানিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ, ২৯টি কোম্পানির ওষুধ স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিতকরণ এবং ২৩টি কোম্পানিকে উন্নয়নের শর্তারোপ
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সরকারের নির্দেশণা অনুযায়ী ২০১৩ সালে অধিদপ্তরে একটি নৈতিকতা কমিটি গঠন
- সেবাদান প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে ইনোভেশন টিম গঠন
- ২০১৩ সালে এডিআর মনিটরিং সেল পুনঃগঠন ও ন্যাশনাল ড্রাগ মনিটরিং সেন্টার গঠন উল্লেখযোগ্য

ওষুধ খাতে উপরোক্ত সম্ভাবনা ও ওষুধ নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে উল্লিখিত উদ্যোগ সত্ত্বেও এ খাতে কিছু সমস্যাও লক্ষ্যণীয়। কিছুসংখ্যক কোম্পানি মানসম্মত ওষুধ উৎপাদনের মাধ্যমে স্থানীয় ও বিশ্ববাজারে ভূমিকা রাখলেও বেশকিছু কোম্পানির বিরুদ্ধেই নানাবিধ অভিযোগ রয়েছে- নিম্নমানের ওষুধ তৈরী, অবৈধ ও অপ্রয়োজনীয় ওষুধের বাজারজাতকরণ, গুড ম্যানুফেকচারিং প্রাকটিস (জিএমপি) অনুসরণ না করা ইত্যাদি। আবার ওষুধের বাজার সম্পর্কে কিছু সাধারণ অভিযোগও লক্ষ্যণীয়- ওষুধ শিল্পের দুর্বল তদারকি এবং পরিবীক্ষণ, ওষুধের মূল্য নির্ধারণে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির অভাব, মেয়াদউত্তীর্ণ ওষুধের ক্রয়-বিক্রয় ও অবৈধ ড্রাগ স্টোরের বিস্তার উল্লেখযোগ্য[১৩]। বিভিন্ন সময়ে ভেজাল, মেয়াদউত্তীর্ণ ও নিম্নমানের ওষুধ নিয়ন্ত্রণে ওষুধ প্রশাসনের দুর্বল তদারকি এবং ব্যবস্থাপনার ঘাটতির কারনে জনস্বাস্থ্য হুমকীর সম্মূখীন হয়েছে। ১৯৮০-

[১১] দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, ১০ আগস্ট, ২০১৪।
[১২] ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ২০১৪
[১৩] Islam MS. “Therapeutic drug use in Bangladesh: policy versus practice”, Indian Journal of Medical Ethics, 2008 January- March; 5(1)

২০০৯ সাল পর্যন্ত ভেজাল প্যারাসিটামল ওষুধ খেয়ে ২০০০ এর বেশি শিশুর মৃত্যুর ঘটনা ঘটে[১৪]। ২০০৯ সালে ঢাকা শিশু হাসপাতাল ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭টি শিশুর মৃত্যুর কারণ হিসেবে ধারণা করা হয় ভেজাল প্যারাসিটামল খেয়ে তারা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল[১৫]। এ ঘটনা তদন্তে প্রকাশিত হয় যে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর হতে রীড ফার্মার প্যারাসিটামল তৈরির কোনো অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও কোম্পানিটি বেশ কয়েক বছর ধরে প্যারাসিটামল সিরাপ তৈরি করে আসছিল। উপরোক্ত ঘটনাগুলোর প্রেক্ষিতে ভেজাল ও নকল ওষুধ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন সময়ে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং এ লক্ষ্যে ক্ষেত্রবিশেষে কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও নকল, নিম্নমান ও ভেজাল ওষুধের উৎপাদন অব্যহত থাকে। ২০১২ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি একটি টিম গঠন করে পরিদর্শণ চালিয়ে ৭৩টি ওষুধ কোম্পানিকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং এর মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ ছিল ২৯টি[১৬]। এছাড়া উক্ত টিম অধিকাংশ কারখানারই উৎপাদন পদ্ধতি, মান ও পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। এ ঘটনাগুলো মূলত: ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের দুর্বল তদারকি ও অব্যবস্থাপনার উদাহরণ।

বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত ওষুধের বাজার মূলত: তুলনামূলক দুর্বল এবং মোটামুটি নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামোর দেশসমূহে বিদ্যমান, যেমন- ভূটান, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, ভিয়েতনাম এবং মায়ানমার ইত্যাদি (আইএলও, ২০০৮)। ওষুধ কোম্পানিগুলোর মধ্যে কয়েকটি ছাড়া এখনও পর্যন্ত বেশিরভাগ কোম্পানিই কঠোর বা যথাযথ নিয়ন্ত্রণমুলক বাজারে ওষুধ রপ্তানির স্বীকৃতি সম্পূর্ণভাবে পায়নি। যদিও তারা এ সকল বাজারে প্রবেশের স্বীকৃতি লাভের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশে ওষুধ বাজার নিয়ন্ত্রণে কঠোর নিয়মকানুন থাকলেও তা কাগজে-কলমে বিদ্যমান, বরং দুর্নীতি, ওষুধ শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের দুর্বলতা এ বাজারকে অনিয়ন্ত্রিত বাজারে পরিণত করেছে[১৭]। ওষুধ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের ওষুধ কোম্পানিগুলোর গুড ম্যানুফেকচারিং প্রাকটিস (জিএমপি) এর অভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়, যেখানে দেখা যায় ওষুধ কোম্পানিগুলোর একটি বড় অংশই প্রকৃতপক্ষে গুড ম্যানুফেকচারিং প্রাকটিস অনুসরন করে না[১৮]। এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ওষুধ শিল্প তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের ঘাটতি লক্ষণীয়। ধারণা করা যেতে পারে, ওষুধ প্রশাসনের তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে বিশ্ববাজারে দেশীয় ওষুধের বিপণন আরো বৃদ্ধি সম্ভব।

সুতারাং উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় জনস্বাস্থ্যের জন্য ওষুধ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হওয়া সত্ত্বেও ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক ওষুধের বাজার যথাযথ তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের ঘাটতির কারনে দেশের জনস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং সম্ভাবনাময় এই শিল্পের ভাবমূর্তী বিনষ্ট হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। ওষুধ নিয়ন্ত্রণে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি বিষয়ে গণমাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে তথ্য প্রকাশিত হলেও এ প্রতিষ্ঠানের সুশাসনের ওপর কাঠামোবদ্ধ গবেষণার অপর্যাপ্ততা রয়েছে। উপরন্তু সুশাসন প্রতিষ্ঠায় টিআইবি জনগুরুত্বপূর্ণ যে খাতগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করে থাকে স্বাস্থ্যখাত তার অন্যতম। ওষুধ খাত যেহেতু স্বাস্থ্যখাতেরই একটি অপরিহার্য অংশ তাই উপরিল্লিখিত প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা বিবেচণায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) 'ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে সুশাসন: চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক এ গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করেছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ওষুধের বাজার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা। এছাড়াও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে-

- ওষুধের উৎপাদন, বাজার নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতি ও আইন পর্যালোচনা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ নিরূপণ করা
- ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সেবা কার্যক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা, সীমাবদ্ধতা, চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন ও ক্ষেত্র তুলে ধরা
- ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ও তদারকি ব্যবস্থাপনাকে উন্নত ও টেকসইকরণ এবং দুর্নীতি ও অনিয়মরোধে সুপারিশ প্রণয়ন করা

---

[১৪] Justice delayed Justice denied, The Daily Star, Dhaka, 11 November, 2009

[১৫] http://www.bbc.co.uk/bengali/news/story/2009/10/printable/091012_msridpharmasurrender.shtml

[১৬] ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ২০১৪

[১৭] "Improving The Competitiveness of the Pharmaceutical Sector In Bangladesh", World Bank Policy note, World Bank, April, 2007

[১৮] প্রাগুক্ত, ১৩

এ গবেষণায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের আওতাধীন পাঁচ শ্রেণির ওষুধ কোম্পানির মধ্যে (অ্যালোপ্যাথি, ইউনানি, আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথি ও হারবাল) শুধুমাত্র অ্যালোপ্যাথি ওষুধের বাজার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি গবেষণার আওতাভুক্ত। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সুশাসন আলোচনার ক্ষেত্রে সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকের (আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ, সংবেদনশীলতা, সেবার ঘাটতি ও দুর্নীতি) ওপর ভিত্তি করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য এই গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং অংশীজনের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে এটি ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে চলমান সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি গুণবাচক গবেষণা। গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে সংগৃহীত তথ্য যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করে এ প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্যের উৎস ও তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে নিচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	তথ্যদাতা	সংখ্যা
মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী (বর্তমান ও সাবেক)	৩৫ জন
	ওষুধ কোম্পানির মালিক ও রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স ম্যানেজার/ অফিসার	৪০জন
	ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য	০৫ জন
	ওষুধ দোকানের মালিক	৩৫জন
	ওষুধ খাত বিশেষজ্ঞ	৮ জন
	বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল	২ জন
	বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি	৪ জন
দলগত আলোচনা	বিসিডিএস প্রতিনিধি (কেন্দ্রিয় ও জেলা পর্যায়ে)	১০টি
পর্যবেক্ষণ	কেন্দ্রিয় অফিসসহ ১০টি ফিল্ড অফিস	
	৪টি ওষুধ কারখানা	
	ঢাকা জাতীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার ও কেন্দ্রিয় ওষুধ পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম	

১.৩.২ প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

১.৩.২.১ মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

ওষুধ শিল্পের উৎপাদন, বাজার নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ক্ষেত্রে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কার্যপদ্ধতিতে বিদ্যমান সমস্যা, সীমাবদ্ধতা ও তার প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় মতামত নেয়ার জন্য মোট ১২৯ জন মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে।

মুখ্যতথ্যদাতার ধরন

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা (কেন্দ্রিয় ও জেলা পর্যায়ে); ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটির সদস্য, ওষুধ কোম্পানির মালিক ও কর্মকর্তা (রেগুলেটরি); ওষুধ দোকানের মালিক; বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল (বিপিসি), বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি (বিপিএস), বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ড্রাস্ট্রি (বিএপিআই) ও বাংলাদেশ কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট সমিতি (বিসিডিএস) এর প্রতিনিধি; চিকিৎসক; পুলিশ কর্মকর্তা এবং ওষুধখাত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও গবেষক।

১.৩.২.২ দলীয় আলোচনা

মাঠ পর্যায়ে ওষুধের বাজার তদারকি ও ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সেবা কার্যক্রমে বিদ্যমান সমস্যা ও অনিয়মের ধরন ও প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য দেশের ১০টি জেলায় (ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, পাবনা, যশোর, ফরিদপুর ও খুলনা) একটি করে মোট ১০টি ছোট দলীয় আলোচনার আয়োজন করা হয়।

দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীর ধরন

ওষুধ দোকানের মালিক ও বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট সমিতির প্রতিনিধি। আলোচনার সময় ওষুধ দোকানের মালিক ও বিসিডিএস এর জন্য পৃথক চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে।

১.৩.২.৩ কেস স্টাডি

ওষুধ প্রশাসনের সুশাসনগত সমস্যা বোঝার জন্য প্রযোজ্যক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক কেস স্টাডি করা হয়েছে।

১.৩.২.৪ পর্যবেক্ষণ

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা, সেবা কার্যক্রম পরিচালনার কৌশল সংক্রান্ত বিষয়সমূহ কেন্দ্রিয় ও মাঠ পর্যায়ের অফিস (ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, পাবনা, যশোর, ফরিদপুর ও খুলনা) পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া ওষুধ পরীক্ষাগারের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ধারণার জন্য ঢাকাস্থ জাতীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার ও কেন্দ্রিয় ওষুধ পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

১.৩.২ পরোক্ষ উৎস:

পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বিদ্যমান আইন ও বিধিসমূহ, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, দাপ্তরিক নথি,গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন ব্যবহার করা হয়েছে।

১.৪ তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা:

এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে গুণগত গবেষণা পদ্ধতিতে অনুসরণকৃত ৪টি সাধারণ বৈশিষ্ট্য যথা তথ্যের dependability, transferability, confirmability ও credibility নিশ্চিত করা হয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকিংসহ সম্ভাব্য সকল সূত্রসমূহ থেকে যাচাই বাছাই করা হয়েছে। এছাড়া ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের (বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি, বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল, বাংলাদেশ কেমিস্ট ও ড্রাগিস্ট সমিতি) সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। পরবর্তীতে তাদের মতামত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচণায় এনে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়।

১.৫ গবেষণার সময়কাল

এই গবেষণা কার্যক্রমটি মার্চ ২০১৪ - জানুয়ারি ২০১৫ সময়ের মধ্যে পরিচালিত হয়।

১.৬ প্রতিবেদন কাঠামো

এই প্রতিবেদনে মোট ছয়টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি ও পরিধি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ওষুধ প্রশাসনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কার্যাবলী এবং ওষুধ প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ওষুধ প্রশাসনের আইনি কাঠামোর সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ওষুধ প্রশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় বিদ্যমান সমস্যা, সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে সেবা কার্যক্রমে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন তুলে ধরা হয়েছে। সর্বশেষ অধ্যায়ে ঔষধ প্রশাসন কর্তৃক ওষুধ শিল্প তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে সুশাসনের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ হতে উত্তরণে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

অধ্যায় দুই
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ও সহযোগী অংশীজন

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশের ওষুধের একমাত্র লাইসেন্সিং ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে তৎকালীন পাকিস্থান কেন্দ্রীয় সরকারের 'কন্ট্রোলার অব ড্রাগস' এর অধীনে ওষুধ প্রশাসন যাত্রা শুরু করে। স্বাধীনতাযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশ গঠিত হওয়ার পর এ প্রতিষ্ঠানটি স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সংযুক্ত বিভাগ হিসেবে কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ ২০১০ সালের ১৭ জানুয়ারী এটিকে ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর হতে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে। ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর ওষুধ আইন প্রয়োগ করে ওষুধ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। ওষুধ উৎপাদন ও রপ্তানিতে ওষুধ কোম্পানিগুলোর মধ্যে কিছুসংখ্যক কোম্পানি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে এবং এ সকল কোম্পানির উৎপাদিত ওষুধ প্রায় ৮৭টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য	
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	▪ ক্রয়সাধ্য মূল্যে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন ওষুধের সহজলভ্য এবং প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা ▪ দেশে তৈরিকৃত ওষুধের উৎপাদনসহ বিদেশে আমদানীকৃত ও রপ্তানিযোগ্য ওষুধসমূহের গুণগত মান, নিরাপত্তা, ও কার্যকরতা নিশ্চিত করা
আইনগতভিত্তি	ওষুধ আইন ১৯৪০; ড্রাগ রুলস ১৯৪৫ ও ১৯৪৬; ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ,১৯৮২; জাতীয় ওষুধ নীতি, ২০০৫
কাজের আওতা	মোট কোম্পানি- ৮৫৪টি (অ্যালোপ্যাথি- ২৭৩, ইউনানি- ২৬৬, আয়ুর্বেদিক- ২০৫ ও হোমিওপ্যাথি- ৭৯ হারবাল-৩১); রেজিস্টার্ড খুচরা ও পাইকারি ওষুধের দোকান- ১,১২,২১৮টি
কার্যালয়	৫২টি (ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয় ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সহ)
সংশ্লিষ্ট কমিটি	১০টি (ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কমিটি. ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কমিটির টেকনিক্যাল সাব-কমিটি, প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি, মূল্য নির্ধারণ কমিটি, হারবাল ওষুধ অ্যাডভাইজারি কমিটি, স্ট্যান্ডিং কমিটি ফর ইমপোর্ট অব ফার্মাসিউটিক্যালস, এডিআর অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল, এডিআর মনিটরিং সেল, জেলা ড্রাগ লাইসেন্স কমিটি)
সহযোগী অংশীজন	বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল, বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি, বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট সমিতি

২.১ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যাবলী

- কারখানা স্থাপনের নতুন প্রকল্পের প্রস্তাবনা মূল্যায়ন
- ওষুধের নিবন্ধন প্রদান ও নবায়ন
- নমুনা পরীক্ষা ও মান নিয়ন্ত্রণ
- মূল্য নির্ধারণ
- উৎপাদন কারখানা পরিদর্শন
- ব্লক লিস্ট অনুমোদন
- রেসিপি অনুমোদন
- ওষুধের ফয়েল, ইনসার্ট, লেবেল এবং মোড়ক অনুমোদন
- লিটারেচার অনুমোদন
- উৎপাদন ও বিপণনের ওপর নজরদারি
- রপ্তানির নিবন্ধন, ফ্রি সেলস সার্টিফিকেট, জিএমপি (গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্রাকটিস) এবং সিপিপি (সার্টিফিকেট ফর ফার্মাসিউটিক্যাল প্রডাক্ট) সার্টিফিকেট প্রদান

২.২ জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমোদিত জনবল ৩৭০ জন (১ম শ্রেণীর ১১৮ জন, ২য় শ্রেণীর ২৫ জন, ৩য় শ্রেণীর ১১৫ জন এবং ৪র্থ শ্রেণীর ১১২ জন)। সার্বিকভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে অনুমোদিত পদের বিপরীতে ৩৮ শতাংশ পদ শূণ্য রয়েছে (কর্মরত ২৩১ ও শূণ্য পদ ১৩৯)।

সারণি ২.১ : ওষুধ প্রশাসনের জনবল[১৯]

শ্রেণী	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্যপদ
১ম	১১৮	৮২	৩৬
২য়	২৫	৪	২১
৩য়	১১৫	৫৫	৬০
৪র্থ	১১২ (৫৭+ আউট সোর্স ৫৫)	৯০	২২
মোট	**৩৭০**	**২৩১**	**১৩৯**

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রধান হচ্ছেন মহা-পরিচালক। মহা-পরিচালকসহ ৪ জন পরিচালকের নেতৃত্বে ৩৭০ জনবল কাঠামো দ্বারা এ প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিচালক- ম্যানুফ্যাকচারিং, রেজি: অ্যান্ড ইম্পোর্ট-এক্সপোর্ট এর অধীনে ওষুধ কারখানা স্থাপনের নতুন প্রকল্পের প্রস্তাবনাসমূহ মূল্যায়ন, ওষুধ উৎপাদনের নিবন্ধন প্রদান ও নবায়নসহ ওষুধ আমদানি ও রপ্তানির কার্যক্রম ন্যস্ত করা হয়েছে। পরিচালক- প্রশাসন, পাইকারি ও খুচরা ড্রাগ লাইসেন্স এর আওতায় ২৩১ জন জনবলের সমন্বয়ে কেন্দ্রিয় ও স্থানীয় পর্যায়ে ৬টি বিভাগের ৪৮টি জেলার (এ কার্যালয়গুলোতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হচ্ছেন ওষুধ তত্ত্বাবধায়ক যিনি ওষুধ পরিদর্শকের ভূমিকা পালনের পাশাপাশি মহাপরিচালকের পক্ষে লাইসেন্সিং অথরিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন)। প্রশাসনিক কার্যক্রম ও পাইকারি এবং খুচরা ড্রাগ লাইসেন্স সম্পর্কিত কার্যাবলী ন্যস্ত করা হয়েছে। ভেটেরিনারি ওষুধ সংক্রান্ত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পরিচালক- ভেটেরিনারির আওতায় ২০ জনের জনবল কাঠামো রয়েছে। ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণ, কোম্পানিগুলোর ওষুধ উৎপাদন পরবর্তী বিপণন কার্যক্রম ও সেন্ট্রাল ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরির কার্যক্রম পরিচালনায় মোট ৬৬ জনের জনবল অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী দায়িত্ব বণ্টনের এ কাঠামো তৈরি করা হলেও এখনো তা কার্যকর করা হয়নি। এছাড়া অনুমোদিত জনবলের অভাবে ১৬টি জেলায় অফিস স্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

২.৩ রাজস্ব আয় ও ব্যয়

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের গত ৫ বছরের (২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪) বাজেট বিশ্লেষণে দেখা যায়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য অনুমোদিত বাজেটের গড়ে মাত্র ০.১৮ শতাংশ এ অধিদপ্তরের জন্য ব্যয় করা হয় এবং বাজেটের বেশিরভাগই খরচ হয় বেতনভাতা ও বাড়িভাড়াসহ বিভিন্ন অনুন্নয়ন ব্যয়ে। উল্লেখ্য, আমাদের প্রতিবেশি দেশ ভারত ও পাকিস্তানে ওষুধ প্রশাসনের জন্য স্বাস্থ্য খাতে মোট বরাদ্দের যথাক্রমে ৫.২৫ ও ০.৮০ শতাংশ ব্যয় করা হয়। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর যেহেতু একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান এবং এটি রেগুলেটরি কাজের পাশাপাশি লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করে তাই এর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে মানব সম্পদ উন্নয়ন, গবেষণাগার উন্নয়ন, আধুনিকায়ন এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজে পর্যাপ্ত ব্যয় থাকা প্রয়োজন।

চিত্র ২.২: ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের চিত্র (কোটি টাকায়)

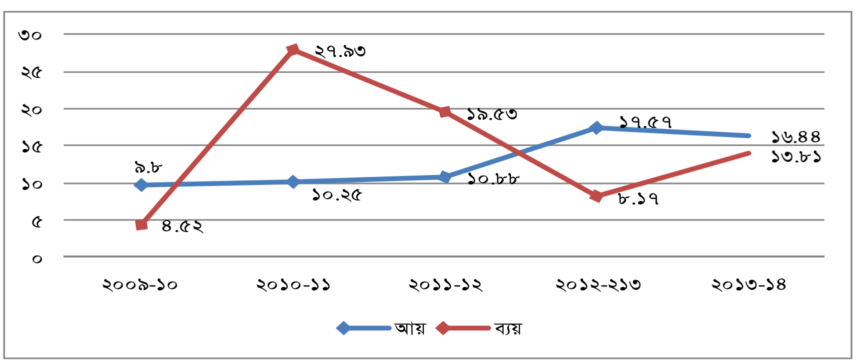

২.৪ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট কমিটি

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ১০টি বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক কমিটি আছে। এই কমিটিগুলো মূলত ওষুধ খাতের বিভিন্ন বিষয়ের কার্যকর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নিম্নে এ কমিটিগুলোর নাম, সদস্য সংখ্যা ও কার্য-পরিধি ছকের সাহায্যে তুলে ধরা হল-

[১৯] তথ্য সূত্র: ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ২০১৪

ক্র. নং	কমিটির নাম	সদস্য সংখ্যা	কমিটির কার্য-পরিধি
০১.	ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কমিটি	২২	• ওষুধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর ৪(২), ৫(২), ৬(২) ও ৬(৩) ধারায় বর্ণিত দায়িত্ব পালন • অন্য যেকোনো সুনির্দিষ্ট বিষয় যা অধ্যাদেশ বা অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বিধির আওতায় রয়েছে
০২.	ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কমিটির টেকনিক্যাল সাব কমিটি	১৯	• নতুন ওষুধ এবং প্রচলিত ওষুধের নতুন আকার ও মাত্রায় ওষুধের রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে মতামত প্রদান • ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কমিটিকে সার্বিক টেকনিক্যাল সহায়তা প্রদান • ওষুধ সম্পর্কিত আইন/অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বিধির আওতায় বিজ্ঞাপিত বিষয় সম্পর্কে সুপারিশ বা মতামত প্রদান
০৩.	নতুন ওষুধ শিল্প স্থাপনের জন্য প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি	৭	• নতুন ওষুধ শিল্প স্থাপনের নীতিমালা প্রস্তুত করা • ওষুধ শিল্প অনুসরণের জন্য জিএমপি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রস্তুত করা • নির্ধারিত নীতিমালার ভিত্তিতে ওষুধ শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব মূল্যায়ন ও অনুমোদন করা, যথা প্রকল্পের বাগানের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি, প্রযুক্তি হস্তান্তর, মেশিনারী ও ইকুইপমেন্ট বিষয়ক প্রযুক্তির সফটওয়ার, উৎপাদিতওষুধের ধরন ও পরিমান, জনবল, গুনগতমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং সিজিএমপি • বর্তমানে চালু ওষুধ শিল্পসমূহের সমপ্রসারণ ও আধুনিকরণ এর প্রস্তাবে মূল্যায়ণ করা • উদ্যোক্তাকে নতুন ওষুধ শিল্প স্থাপনের জন্য বিনিয়োগে উৎসাহ ও অনুমোদন প্রদান করা
০৪.	ওষুধের মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক কমিটি	১৬	• ওষুধের মূল্য নির্ধারন সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন • আমদানীকৃত ও দেশে প্রস্তুতকৃত এ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ওষুধের খুচরা মূল্য নির্ধারন
০৫.	ওষুধের মূল্য নির্ধারনের টেকনিক্যাল সাব-কমিটি	১১	• ওষুধের মূল্য নির্ধারন সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন • আমদানীকৃত ও দেশে প্রস্তুতকৃত এ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ওষুধের খুচরা মূল্য নির্ধারণের জন্য মূল্য নির্ধারণ কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা
০৬.	স্ট্যান্ডিং কমিটি ফর ইমপোর্ট অব ফার্মাসিউটিক্যালস	১৩	• আমদানীযোগ্য ওষুধ প্রস্তুত করার জন্য কাঁচামাল আমদানীর প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করন এবং চাহিদা অনুসারে ওষুধ ও ওষুধ প্রস্তুত করার কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রীর ব্লকলিস্ট অনুমোদন
০৭.	হারবাল ওষুধ অ্যাডভাইজরি কমিটি	১৩	• বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বীকৃত, প্রচলিত ও ব্যবহৃত হার্বাল ওষুধ দেশে আমদানি, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে নিবন্ধনের আবেদনসমূহ উল্লিখিত ওষুধের নিরাপত্তা, কার্যকারিতা এবং উপযোগিতা মূল্যায়ণ এবং সুপারিশ প্রদান করা • হার্বাল ফার্মাকোপিয়া প্রণয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা
০৮.	অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়েকশন অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল	১৬	• ওষুধের বিরুপ প্রতিক্রিয়া পরীবিক্ষণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে কর্মসূচী গ্রহণে পরামর্শ প্রদান • এডিআর মনিটরিং, এডিআর ফর্ম সংগ্রহ ও পর্যালোচনায় কার্য পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণ • এডিআর মনিটরিং মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও সুপারিশ ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর ও হেলথ প্রফেশনালদেরদের অবহিতকরণ ও পদক্ষেপগ্রহণে পরামর্শ প্রদান
০৯.	অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়েকশন মনিটরিং সেল	০৬	• এডিআর রিপোর্ট সংগ্রহ ও মূল্যায়ন
১০.	জেলা ড্রাগ লাইসেন্সিং কমিটি	০৬	• নতুন ড্রাগ লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স বাতিলের সুপারিশ করা

২.৫ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সহযোগী অংশীজন

বাংলাদেশে ওষুধখাতের প্রধান নিয়ন্ত্রক ও সমন্বয়ক হিসেবে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরকে যেসব স্টেকহোল্ডারদের সাথে কাজ করতে হয় তাদের প্রধান কার্যাবলী ও অধিদপ্তরের সাথে তাদের কাজের সম্পর্ক নিম্নের সারণিতে দেওয়া হলো।

অংশীজনের নাম ও কার্যাবলী	ওষুধ প্রশাসনের সাথে কাজের সম্পর্ক ও কার্যাবলীসমূহ
বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিল বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় এর অধীনে একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল দেশে ফার্মেসী সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রন করা। ফার্মেসী কাউন্সিল যেসব কাজ করে থাকে তা হলো: • ফার্মাসিস্ট হিসেবে উপযুক্ত ব্যক্তিদের রেজিস্ট্রেশনের প্রদান • ফার্মেসি সংক্রান্ত বিষয়ের নির্দেশণা এবং অধীত বিষয়গুলোর ব্যবহারিক প্রশিক্ষনের অনুমোদন প্রদান • ফার্মাসিস্ট হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা রেজিস্ট্রেশনের নিমিত্তে ডিগ্রি অথবা ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসীর স্বীকৃতিপ্রদান ফার্মাসিস্ট ও শিক্ষানবীশদের রেজিস্টার তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণ করা	• ফার্মেসি কাউন্সিল হতে প্রাপ্ত রেজিস্ট্রেশনের ওপর ভিত্তি করে ওষুধ প্রশাসন খুচরা ও পাইকারি ওষুধের দোকানের (সি গ্রেড ফার্মাসিস্টদের) লাইসেন্স প্রদান • ফার্মেসি কাউন্সিলের মনোনীত সদস্য ওষুধ প্রশাসনের ওষুধ সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি পর্যালোচণা বিষয়ক কমিটিতে অংশগ্রহণ ও পরামর্শ প্রদান • ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কমিটিতে সদস্য হিসেবে কাজ করা
বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি দেশের ফার্মেসি পেশাজীবিদের একটি স্বীকৃত সংগঠন। এটি ফার্মাসিস্টদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন এবং তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় সমন্বয়সহ সরকারের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ও কর্মসূচীতে ওষুধ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটির প্রধান কাজসমূহ হলো: • ফার্মেসি পেশাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ফার্মেসির বিভিন্ন শাখায় গবেষণা ও সমস্যা সনাক্তকরণ ও সমাধান • ফার্মেসি আইন পরিবর্ধণ ও পরিমার্জনের ক্ষেত্রে সরকারকে পরামর্শ প্রদান	• ওষুধ প্রশাসনের কার্যকর তত্ত্বাবধান ও পরীবিক্ষণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স গ্রুপের সভায় সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ ও ওষুধ সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি পর্যালোচণা বিষয়ক কমিটিতে অংশগ্রহণ করা পরামর্শ প্রদান • ড্রাগ টেকনিক্যাল কমিটিতে অংশগ্রহণ করা ও পরামর্শ প্রদান • ওষুধের মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন এবং আমদানিকৃত ও দেশে প্রস্তুতকৃত ওষুধের খুচরা মূল্য নির্ধারনে মূল্য নির্ধারণ কমিটিকে সহায়তা করা
বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতি বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতি ১৯৭২ সালে ২৩টি ওষুধ কোম্পানির সদস্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে প্রায় ১৪৯ টি কোম্পানি এই সমিতির অধিভুক্ত সদস্য। এই সমিতি বাংলাদেশের বেসরবারি উদ্যোগে গঠিত ওষুধ কোম্পানিগুলোর নিবন্ধনকৃত সংগঠন। বাংলাদেশের ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলোর স্বার্থ সংরক্ষণ করা এই প্রতিষ্ঠানের মূল দায়িত্ব। এছাড়াও এ প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহনের পাশাপাশি দেশের স্বাস্থ্যসেবায় বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে।	ওষুধ প্রশাসনের সকল কমিটিতে অংশগ্রহণ ও পরামর্শ প্রদান করা। বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতির মনোনীত সদস্যবৃন্দ নিম্নোক্ত কমিটিগুলোতে কাজ করে থাকে- • ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কমিটি • ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কমিটির টেকনিক্যাল সাবকমিটি • নতুন ওষুধ শিল্প স্থাপনের জন্য প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি • ওষুধের মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক কমিটি • ওষুধের মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক টেকনিক্যাল সাবকমিটি • হার্বাল ওষুধ অ্যাডভাইজরী কমিটি • স্ট্যান্ডিং কমিটি ফর ইমপোর্ট অব ফার্মাসিউটিক্যালস • অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়েকশন অ্যাডভাইজরী কাউন্সিল • অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়েকশন মনিটরিং সেল
বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট সমিতি (বিসিডিএস) বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট সমিতি ওষুধ ব্যবসায়ীদের একটি সংগঠন। বাংলাদেশের ওষুধ ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা এই প্রতিষ্ঠানের মূল দায়িত্ব। এছাড়াও ওষুধ ব্যবসায় একটি সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন এবং এই ব্যবসায়ে একটি সুষ্ঠু প্রতিযোগীতা সৃষ্টি করা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।	বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট সমিতি নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে ওষুধ প্রশাসনের সাথে কাজ করে থাকে। • ওষুধের বাজার তদারকিতে ওষুধ প্রশাসনকে সহায়তা করা • ওষুধ ব্যবসায় সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়নে ওষুধ প্রশাসনকে সহায়তা করা • ওষুধের মূল্য নির্ধারণ সমপর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন এবং আমদানিকৃত ও দেশে প্রস্তুতকৃত ওষুধের বিষয়ে খুচরা মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক কমিটিতে অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করা।

অধ্যায়ঃ তিন

ওষুধ নিয়ন্ত্রণে আইনি সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে ওষুধ খাত তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, আইন ও বিধি রয়েছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এ সকল আইন, বিধি ও নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। এ কারনে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সুশাসনগত অবস্থা জানার জন্য এ সংক্রান্ত আইন ও নীতি কাঠামো বিশ্লেষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের ওষুধের বাজার নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিতে বিদ্যমান আইন ও নীতিসমূহের উল্লেখযোগ্য দিক, সীমাবদ্ধতা এবং প্রয়োগে চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

৩.১ ওষুধ নিয়ন্ত্রণে আইন ও নীতিসমূহ

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম যে সকল আইন ও নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়, এগুলো হলো

- ওষুধ আইন, ১৯৪০
- ড্রাগ রুলস, ১৯৪৫ ও বেঙ্গল ড্রাগ রুলস, ১৯৪৬
- জাতীয় ওষুধ নীতি, ২০০৫
- ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২

উপরিল্লিখিত আইন ও নীতিসমূহ বাংলাদেশের ওষুধের বাজার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরকে সার্বিকভাবে নিম্নোক্ত আইনি ক্ষমতা প্রদান করেছে-

- ওষুধ নিয়ন্ত্রণ পরিষদ গঠনের মাধ্যমে ওষুধের নিবন্ধন, অনুমোদন ও বাতিল করা
- জাতীয় ওষুধ উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে সরকারকে প্রয়োজনীয় ওষুধ সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা
- কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত তা নিস্পত্তির লক্ষ্যে ড্রাগ অ্যাপিলেট অথরিটি গঠন করা
- ফার্মেসি কাউন্সিলের নথিভুক্ত কোনো ওষুধ প্রস্তুতকারীর তত্ত্বাবধান ব্যতীত ওষুধ প্রস্তুত ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করা
- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্দেশিত গুড ম্যানুফেকচারিং প্রাকটিস(জিএমপি) বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- প্রয়োজনীয় ওষুধ সমূহের মূল্য নির্ধারণ করা
- ওষুধের বিজ্ঞাপন ও প্রচার নিয়ন্ত্রণ করা
- ওষুধ সংক্রান্ত অপরাধ দমনে ওষুধ আদালত গঠন এবং জরিমানা আরোপ করা, বিশেষতঃ ক্ষতিকারক, ভেজাল ও নিষিদ্ধ ওষুধ তৈরী, নিম্নমানের ওষুধ প্রস্তুত ও বিক্রয়, অবৈধভাবেভাবে ওষুধ ও কাঁচামাল আমদানী করা, সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে বেশি দামে ওষুধ বিক্রয় এবং ওষুধের অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রচার ইত্যাদি।

৩.২ বাংলাদেশে ওষুধ আইন ও ওষুধ নীতির ক্রমবিকাশ

১৯৩৭ সালে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায় কেন্দ্রিয় সরকার কর্তৃক গঠিত ওষুধ অনুসন্ধান কমিটি সর্বপ্রথম ওষুধ আমদানি নিয়ন্ত্রন বিষয়ক সুপারিশ সম্বলিত একটি বিল কেন্দ্রিয় আইন পরিষদে উপস্থাপন করে। পরবর্তীতে এ বিষয়ে গঠিত মূল্যায়ন কমিটি ওষুধ আমদানির সাথে সাথে উৎপাদন ও বিতরনের জন্য উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণেরও পরামর্শ প্রদান করে। কেন্দ্রিয় সরকার এ প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকারকে রেজুলেশন পাশ করার আদেশ প্রদান করে এবং এ সংক্রান্ত একটি আইন পাশ করার জন্য তা কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট প্রেরণের নির্দেশ দেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪০ সালের ১০ই এপ্রিল সর্বপ্রথম ভারত সরকার কর্তৃক ওষুধের আমদানি, রপ্তানি, উৎপাদন, পরিবেশন ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে ওষুধ আইন, ১৯৪০ প্রণীত হয় এবং ১৯৪৫ সালের ২১ ডিসেম্বর এ আইনের প্রথম ওষুধ বিধি, ১৯৪৫ ও পরবর্তী বছরের ৭ই জানুয়ারী বেঙ্গল ওষুধ বিধি, ১৯৪৬ প্রণীত হয়। পরবর্তীতে আইনটি পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ১৯৫৭ সালে গৃহীত হয় এবং ১৯৬৩ সালে পুনরায় সংশোধন করা হয়। এরপর ১৯৭৩ সালে ওষুধ উপদেষ্টা কমিটির ব্যবস্থা বিলুপ্তসহ আরো কিছু বিষয়ে সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে আইনটি গৃহীত হয়। ওষুধ আইন, ১৯৪০ এ ওষুধ এর সংজ্ঞা ও নিয়ন্ত্রণে আয়ুর্বেদিক, ইউনানি ও হোমিওপ্যাথিক ওষুধ অন্তর্ভূক্ত ছিল না। এক্ষেত্রে এ বিষয়গুলোকে বিবেচনায় এনে রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে ওষুধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৮২ প্রনীত হয় যেখানে আয়ুর্বেদিক, ইউনানি ও হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সরকারি নিয়ন্ত্রনের অধীনে আনা হয়।

১৯৮২ সালের পূর্বে এদেশে অনৈতিকভাবে ওষুধের প্রচার এবং নিম্নমান ও অপ্রয়োজনীয় ওষুধের বাজারজাতকরণ একটি সাধারণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হত। সেসময়ে বেশিরভাগ ওষুধ কোম্পানিই প্রয়োজনীয় ওষুধ (জীবন রক্ষাকারী ওষুধ) উৎপাদনের পরিবর্তে অপ্রয়োজনীয় ওষুধ যেমন: ভিটামিন, টনিক, এনজাইম, গ্রাইপ ওয়াটার, কাশির সিরাপ ইত্যাদি উৎপাদন করত। এ ধরনের উৎপাদন চর্চা বন্ধ এবং ওষুধের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ১৯৮২ সালে জাতীয় ওষুধ নীতি প্রণয়ন করে। এই নীতি ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের একই বছরে ওষুধ নিয়ন্ত্রন অধ্যাদেশ, ১৯৮২ তৈরী করা হয়। ১৯৮২ সালের ওষুধ নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল পর্যাপ্ত পরিমানে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ তৈরী করা, মান সম্মত ওষুধ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ করা, ওষুধের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করা, কার্যকর ওষুধ তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলা, আধুনিক হাসপাতাল ও ওষুধের খুচরা দোকানের মান উন্নয়ন করা এবং গুড ম্যানুফেকচারিং প্রাকটিস (জিএমপি) অনুসরণ নিশ্চিত করা। বর্তমানে দেশে ওষুধের বাজারের বিস্তৃতি ও ওষুধ খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জনের পেছনে ১৯৮২ সালের ওষুধ নীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ১৯৮২ সালের ওষুধ নীতির প্রয়োজনীয় সকল বিষয় অর্ন্তভুক্ত করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, হাল নাগাদ তথ্য ও প্রয়োজনীয় নতুন উপাদান একীভূত করার মাধ্যমে একটি সময়োপযোগী ওষুধ নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ওষুধ নীতি ২০০৫ প্রণয়ন করা হয়। ২০০৫ সালের ওষুধ নীতি মূলত ১৯৮২ সালের ওষুধ নীতিরই হাল নাগাদ সংস্করণ। এ নীতিতে ওষুধ প্রশাসনকে শক্তিশালীকরণ এবং নতুন প্রযুক্তি ও কারিগরী জ্ঞান হস্তান্তরের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, ADR পরিবীক্ষণ ও ব্যবস্থাপত্র ছাড়া ওষুধ বিক্রয় বন্ধে উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া দেশীয় কোম্পানির স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও গবেষণা কার্যক্রমে উৎসাহিত করার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

২০০৫ সালের ওষুধ নীতির কিছু সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ লক্ষ্যণীয়। এ নীতিতে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা হালনাগাদ ও অন্যান্য ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণে নির্দেশনার অস্পষ্টতা রয়েছে। এছাড়া দেশীয় ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ প্রস্তুতে প্রণোদনার ক্ষেত্রে নীতিগত নির্দেশনারও ঘাটতি লক্ষণীয়। এ নীতিতে আমদানিকারকদের চাহিদা অনুযায়ী যেকোনো ওষুধ উৎপাদনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও হালনাগাদকরণ এবং অন্যান্য ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পদক্ষেপের ঘাটতিসহ অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ উৎপাদনে কোম্পানিগুলোর অনাগ্রহ বৃদ্ধির ঝুঁকিও লক্ষণীয়। আবার এ নীতিতে আমদানিকৃত ওষুধ নিবন্ধনের জন্য বায়োঅ্যাভেইলেবিলিটি ও বায়োইক্যুইভ্যালেন্স তথ্যের ওপর গুরুত্বারোপ করা হলেও বায়োলজিক্যাল ওষুধের অত্যাবশ্যকীয় ক্লিনিক্যাল ট্রায়েল উল্লেখ করা হয়নি এর ফলে দেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী ওষুধের আমদানির ঝুঁকি সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

৩.৩ ওষুধ নিয়ন্ত্রণে আইনসমূহের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

ওষুধ আইন, ১৯৪০

ওষুধ আইন, ১৯৪০ এর মাধ্যমে দেশে নিম্নমান ও ক্ষতিকর ওষুধের অনুপ্রবেশ রোধের জন্য ওষুধের আমদানি নিয়ন্ত্রণ এবং নিম্নমান ও ভেজাল ওষুধ তৈরি বন্ধের জন্য ওষুধ তৈরির ওপর নিয়ন্ত্রন আরোপ করা হয়েছে। এ আইনে সকল ওষুধ তৈরি, বিতরণ বা বিক্রয়ের জন্য লাইসেন্স গ্রহনের বিধান রয়েছে। এ আইনে বলা হয়েছে সরকার প্রদত্ত যথাযোগ্য অনুমোদিত লাইসেন্স বা পারমিটের মাধ্যমেই কেবল কোনো কোনো শ্রেণীর ওষুধ আমদানি চলতে পারে। এছাড়া দেশে আমদানিকৃত সকল শ্রেনীর ওষুধের ক্ষেত্রে নির্ধারিত মান এবং তফসিলে নির্ধারিত লেবেল ও প্যাকিং অনুযায়ী মোড়কবদ্ধ হওয়া বাধ্যতামূলক উল্লেখ করা হয়েছে। এ আইনের বিশেষভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ওষুধ পরিদর্শক দ্বারা লাইসেন্সকৃত স্থানসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে ওষুধ তৈরি বা বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করার বিধান রয়েছে। এছাড়া ওষুধের নমুনা সংগ্রহ করে সেগুলোকে কেন্দ্রীয় ওষুধ পরীক্ষাগারে পরীক্ষা ও বিশ্লেষনের মাধ্যমে ওষুধের মানের ওপর নজরদারির বিধান রাখা হয়েছে। এই আইনের আওতায় ওষুধ সংক্রান্ত একটি উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করা হয় যা এই আইনের প্রয়োগ ও পরিচালনার কারিগরী দিকগুলোর ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২

ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নথিভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ওষুধের কাঁচামাল আমদানি ও উৎপাদন এবং কোনো ওষুধ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত, আমদানি, বিতরণ বা বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ অধ্যাদেশের মাধ্যমে ওষুধ নিয়ন্ত্রণ পরিষদ গঠনের মাধ্যমে পরিষদকে ক্ষমতায়িত করা হয়েছে। এ পরিষদের অনুমতি ব্যতীত কোনো ওষুধ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নথিভুক্ত করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া ওষুধ নিয়ন্ত্রণ পরিষদ যদি কোনো ওষুধের নিরাপত্তা ও ব্যবহারযোগ্যতা সম্বন্ধে সন্তুষ্ট না হয় তাহলে তা বাতিলের সুপারিশ করতে পারবে। ওষুধ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ফর্মেসি কাউন্সিলের 'এ' গ্রেডভুক্ত কোনো রেজিস্ট্রিকৃত ওষুধ প্রস্তুতকারীর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান ব্যতীত ওষুধ তৈরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আবার ওষুধ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিলের নথিভুক্ত কোনো ওষুধ প্রস্তুতকারীর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান ব্যতীত কোনো খুচরা বিক্রেতা কর্তৃক কোনো ওষুধ বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ অধ্যাদেশের মাধ্যমে সরকার কোনো ওষুধের ক্রয়কৃত কাঁচামালের মূল্যের নিরীখে ওষুধের সর্বোচ্চ খুচরামূল্য নির্ধারণক্রমে সরকারি গেজেট

জারিসহ গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ওষুধের মূল্য নির্ধারণ করার কথা বরা হয়েছে। এছাড়া সরকারি গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে প্রয়োজনে ওষুধ আদালত গঠন করার বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

৩.৪ আইনি সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ

৩.৪.১ সমসাময়িক বিষয় ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথেষ্ঠ নয়

ওষুধ আইন, ১৯৪০ ও ওষুধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৮২ সমসাময়িক বিষয় ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথেষ্ঠ নয়। বর্তমান আইনসমূহে মেডিকেল ডিভাইস, ফুড সাপ্লিমেন্ট ও কসমেটিক সামগ্রি অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি। কিন্তু এগুলো মানবস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতসহ অন্যান্য অনেক উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশেই মেডিকেল ডিভাইস, ফুড সাপ্লিমেন্ট ও কসমেটিক সামগ্রির উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি ওষুধ আইনে নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে[২০] কিন্তু আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত উল্লিখিত বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আইনিভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা নেই এবং এগুলো ওষুধ প্রশাসনের কাজের অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। এর ফলে কেউ নিম্নমানের মেডিকেল ডিভাইস, ফুড সাপ্লিমেন্ট ও কসমেটিকস সামগ্রী উৎপাদন, আমদানি ও বাজারজাত করলে এ বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

৩.৪.২ ওষুধ সংক্রান্ত কমিটিগুলোর গঠন ও কর্ম প্রক্রিয়া উল্লেখ না থাকা

১৯৮২ সালের ওষুধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশে ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কমিটির[২১] শুধুমাত্র গঠনের কথা উল্লেখ থাকলেও অন্যান্য কমিটি যেমন- ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কমিটির টেকনিক্যাল সাবকমিটি, প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি, মূল্য নির্ধারণ কমিটি, হার্বাল ওষুধ অ্যাডভাইজারি কমিটি, স্ট্যান্ডিং কমিটি ফর ইমপোর্ট অব ফার্মাসিউটিক্যালস, অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়েকশন অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল কমিটি, এডিআর মনিটরিং সেল এবং জেলা ড্রাগ লাইসেন্স কমিটির গঠন, কর্ম প্রক্রিয়া, সদস্যসংখ্যা ও সদস্যদের যোগ্যতা আইনিভাবে সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। বর্তমানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে চাহিদা অনুযায়ী পরিপত্র প্রণয়নের মাধ্যমে এই কমিটিগুলো গঠন করা হয়। আবার কিছু কমিটিতে সংশ্লিষ্ট সদস্যের পদবীর পরিবর্তে ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে কমিটি গঠন করা হয়েছে, যেমন-ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কমিটি, ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কমিটির টেকনিক্যাল সাবকমিটি, হার্বাল ওষুধ অ্যাডভাইজারি কমিটি। আইনিভাবে কমিটিগুলোর গঠন, কর্ম প্রক্রিয়া, সদস্যসংখ্যা ও সদস্যদের যোগ্যতা উল্লেখ না থাকায় কমিটিগুলোতে রাজনৈতিক বিবেচনায় সদস্য নির্বাচন ও সদস্যদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দের ঝুঁকি সৃষ্টি এবং কমিটিগুলোর দায়িত্ব পালনে সাংঘর্ষিকতার ঝুঁকি সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরী হয়।

৩.৪.৩ কেন্দ্রিয় পরীক্ষাগার স্থাপনের কথা বলা হলেও তার অধীনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বা চাহিদা অনুযায়ী পরীক্ষাগার স্থাপন উল্লেখ না থাকা

ওষুধ আইন, ১৯৪০ এ ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণে একটি কেন্দ্রিয় পরীক্ষাগার স্থাপনের কথা বলা হয়েছে[২২]। কিন্তু তখনকার প্রেক্ষাপটে একটি কেন্দ্রিয় পরীক্ষাগার দ্বারা ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণ বাস্তবসম্মত হলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে ওষুধ শিল্পের বিস্তার, ওষুধের উৎপাদনের ব্যপকতায় একটিমাত্র কেন্দ্রিয় পরীক্ষাগার দ্বারা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা কর্তৃক মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয়। অথচ পরবর্তীতে ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২তে স্থানীয় পর্যায়ে পরীক্ষাগার স্থাপনের বাস্তবতাও এড়িয়ে যাওয়া হয় এবং চাহিদা অনুযায়ী পরীক্ষাগার স্থাপনের কথা উল্লেখ করা হয়নি। এর ফলে আঞ্চলিক পর্যায়ে পরীক্ষাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৩.৪.৪ ওষুধের মূল্য নির্ধারণে গেজেট প্রকাশের সময়কাল সুনির্দিষ্ট না থাকা

১৯৮২ সালের ওষুধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশের ধারা ১১ তে সরকার কোনো ওষুধের কাঁচামালের মূল্যের নিরীখে ওষুধের সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য নির্ধারণক্রমে সরকারি গেজেট প্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে[২৩]। কিন্তু এক্ষেত্রে গেজেট প্রকাশের সময় সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। নিয়মিতভাবে গেজেট প্রকাশ না হওয়ায় উচ্চদামে ওষুধ বিক্রয় করলে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয় না। উল্লেখ্য সর্বশেষ ২০০০ সালে ওষুধের মূল্য নির্ধারণে সরকারিভাবে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে।

---

[২০] The drug and cosmetic Act, 1940 (India): section 3 ; Cosmetics, Devices and Drugs Act No. 27 of 1980 (Srilanka): section 2;

[২১] Drug (Control) ordinance, 1982, Sec11: The Government shall constitute a drug control committee consisting of a chairman and such other members as it may appoint from time to time.

[২২] The Drug Act, 1940 Sec6 (1): The government shall, as soon as may be, establish a Central Drugs Laboratory under the control of a Director to be appointed by the Government, to carry out the functions entrusted to it by this act or any rules made under this chapter

[২৩] Drug (Control) ordinance, 1982, Sec11: The Government may, by notification in the official gazette, fix the maximum price at which any medicine may be sold.

৩.৪.৫ বিধিমালা তৈরী ও হালনাগাদ না করা

ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৮২ সালের ১২ জুন প্রণীত হয়। এ অধ্যাদেশের এখনও পর্যন্ত বিধিমালা তৈরি করা হয় নি। অপরদিকে ওষুধ আইন, ১৯৪০ এর বিধিমালার (ওষুধ বিধিমালা, ১৯৪৫ এবং বেঙ্গল ওষুধ বিধমালা, ১৯৪৬) পরিবর্তীত অবস্থার প্রেক্ষিতে হালনাগাদ করা হয় নি। যেহেতু আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিধিমালা নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে, তাই ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর বিধিমালা তৈরি না হওয়া ও ওষুধ আইন, ১৯৪০ এর বিধিমালা হালনাগাদ না হওয়ায় আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেকসময় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মধ্যে অস্পষ্টতা তৈরি হয়।

৩.৪.৬ ওষুধের অযৌক্তিক ও অপব্যবহার রোধে ব্যবস্থাপত্র বিষয়ে উল্লেখ না থাকা

চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্রে ওষুধের অযৌক্তিক ও অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ওষুধ আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ওষুধের যৌক্তিক ব্যবহার হচ্ছে রোগীর সঠিক ভাবে রোগ নির্ণয় করা, এর জন্য যথেষ্ট সময়কাল পর্যন্ত রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী ওষুধের মাত্রা নির্ধারণ করা এবং রোগীর জন্য সর্বনিম্ন দাম নির্ধারণ করা[২৪]। বিভিন্ন ভাবে ওষুধের অযৌক্তিক ব্যবহার হতে পারে, যেমন- একজন রোগীর জন্য অপ্রয়োজনীয় অনেক ধরণের ওষূধ প্রস্তাব করা, ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের জন্য সঠিকভাবে ওষুধের মাত্রা ব্যবহার না করা, যেখনে প্রয়োজন না সেখানেও অতিরিক্ত ইনজেকশনের ব্যবহার, ক্লিনিকাল নির্দেশিকা অনুযায়ী চিকিৎসা করতে না পারা, কোনো ব্যবস্থাপত্র ছাড়া নিজে নিজে অনুপযুক্ত চিকিৎসা করা ইত্যাদি।[২৫] ওষুধের অযৌক্তিক ব্যবহারে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। সঠিকভাবে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ওষুধের অযৌক্তিক ব্যবহার রোধ করা সম্ভব। ওষুধ আইন, ১৯৪০ এবং ওষুধ (নিয়ন্ত্রন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ তে চিকিৎসকদের ব্যবস্থাপত্রে ওষুধের অযৌক্তিক ও অপব্যবহাররোধে কোন ব্যাবস্থা রাখা হয়নি। এরফলে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার পক্ষে ওষুধের অযৌক্তিক ও অপব্যবহাররোধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহন করা সম্ভব হয় না। এছাড়া দু'টি আইনে ওষুধের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ওষুধ বিক্রয়ে ব্যবস্থাপত্র বিষয়ে উল্লেখ করা হয়নি। এর ফলে খুচরা ওষুধ বিক্রেতার ব্যবস্থাপত্র ছাড়া ওষুধ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার পক্ষে আইনি ব্যবস্থা গ্রহন করা সম্ভব হয় না।

৩.৪.৭ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ওষুধ তৈরি ও অনুমোদনহীন ওষুধ ব্যবস্থাপত্রে প্রস্তাব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দণ্ডের উল্লেখ না থাকা

নিম্নমান, ক্ষতিকর অথবা নকল ওষুধ উৎপাদনে ওষুধ আইন, ১৯৪০ ও ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ তে বিভিন্ন দণ্ডের বিষয় উল্লেখ থাকলেও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ওষুধ তৈরীর ক্ষেত্রে কোন দণ্ডের বিধান উল্লেখ করা হয়নি। অপরদিকে, ওষুধ (নিয়ন্ত্রন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২'তে চিকিৎসক কর্তৃক অনুমোদনহীন ওষুধ ব্যবস্থাপত্রে প্রস্তাব করা নিষেধ করা হলেও এ ক্ষেত্রে নিষেধ অমান্য করা হলে কোন প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা উল্লেখ করা হয়নি। এর ফলে অনুমোদনহীন ওষুধ ব্যবস্থাপত্রে উল্লেখ করা হলে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার পক্ষে আইনি ব্যবস্থা গ্রহন করা সম্ভব হয় না।

৩.৪.৮ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে স্বেচ্ছাচারিতার ঝুঁকি

ওষুধ নিয়ন্ত্রণে দু'টি আইনের মধ্যে ওষুধ আইন, ১৯৪০ এ মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে শাস্তির বিধান রয়েছে। অপরদিকে ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ তে ওষুধ আইন লজ্ঞনে শুধুমাত্র ড্রাগ কোর্টে মামলা করার বিধান রয়েছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে ১৯৪০ সালের আইনের ২৯ ও ৩৭ ধারা সংযুক্ত করা হয়েছে যেখানে শুধুমাত্র ওষুধের বিজ্ঞাপন এবং রাস্তাঘাট ও ওষুধের দোকানে ওষুধ সংক্রান্ত অপরাধে তাৎক্ষনিক বিচার করে জরিমানা ও শাস্তি আরোপ করা হয়, ওষুধ কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হয় না। অপরদিকে ওষুধ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একই সাথে দুটি আইন বলবৎ থাকায় মোবাইল কোর্টে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ড্রাগ কোর্টেও বিচারের সম্মূখীন হন যা আইনি পদক্ষেপ গ্রহণে নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার স্বেচ্ছাচারিতা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের ঝুঁকির সম্ভাবনা তৈরি করে।

৩.৪.৯ আদালতে মামলা নিস্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা

---

[২৪] World Health Organization, *The Rational Use of Drugs, Report of the Conference of Experts*, Geneva; WHO; 1985

[২৫] World Health Organization, *Promoting rational use of medicines: core components,* WHO Policy Perspectives on Medicines, Geneva, WHO, September 2002

ওষুধ আইনের বিধান লঙ্ঘনজনিত অপরাধের মামলা নিস্পত্তির ক্ষেত্রে ওষুধ আদালত বা নিম্ন আদালতে দীর্ঘসূত্রতা লক্ষণীয়। সাধারণত ওষুধ পরিদর্শক বা তত্ত্বাবধায়করা ওষুধ আদালতে মামলা করার পর সংশ্লিষ্ট কোর্ট- বিবাদি পক্ষ বা আসামিকে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করে। এক্ষেত্রে আসামি সশরীরে কোর্টে হাজির হয়ে অথবা তার পক্ষে নিযুক্ত আইনজীবি নির্দিষ্ট সময় চেয়ে আবেদন করে। নিম্ন আদালত হতে প্রাপ্ত এ সূযোগ বা প্রদত্ত সময়ের তোয়াক্কা না করে প্রায়শ বিবাদি ওষুধ কোম্পানিগুলো উচ্চ আদালতে সংবিধানের ৪০ নং অনুচ্ছেদে[২৬] বর্ণিত পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয়েছে দাবি করে বাদি পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। এক্ষেত্রে উচ্চ আদালত বিষয়টিকে আমলে নিয়ে নিম্ন আদালতকে কারণদর্শাও নোটিশ প্রদান করে এবং উচ্চ আদালতের শুনানি না হওয়া পর্যন্ত নিম্ন আদালতের সংশ্লিষ্ট মামলা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম স্থগিত রাখে। বিবাদি পক্ষের এ মামলার প্রেক্ষিতে নিম্ন আদালতের কার্যক্রম অনেকসময়ই দীর্ঘসময় ধরে স্থগিত থাকে। অপরদিকে অনেকসময় উচ্চ আদালত রুলের নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বাদিপক্ষ কর্তৃক অভিযুক্ত কোম্পানি পরিদর্শণসহ নমুনা সংগ্রহের সকল কার্যক্রম স্থগিত রাখে। এর ফলে দেখা যায় অভিযুক্ত কোম্পানি বা ব্যক্তি আদালতে মামলা অনিস্পন্ন থাকা অবস্থায়ও নিম্নমানের ওষুধ উৎপাদন অব্যহত রাখে। উদাহরণস্বরূপ: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ২০১২ সালে একটি পরিদর্শণ টিম গঠন করে ৭৩টি কোম্পানিকে ক্রটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং ওষুধ কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে জনস্বাস্থ্য বিরোধী ওষুধ উৎপাদনের তথ্যসহ রিপোর্ট দিয়ে শাস্তির সুপারিশ করে। পরবর্তীতে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ৪১টি কোম্পানিকে কারণদর্শাও নোটিশ প্রদান করে, অপরদিকে আদালতের স্থগিতাদেশ থাকার কারণে ১৪টি কোম্পানির বিরুদ্ধে নোটিশ প্রদান করতে পারেনি। অথচ এ সময়ে এই কোম্পানিগুলো নিম্নমানের ওষুধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ অব্যহত রাখে।

৩.৪.১০ আইনে কঠোর দণ্ডের অভাব এবং শাস্তি ও দণ্ডের পরিমাণে অসামঞ্জস্যতা

ওষুধ আইনে শাস্তি ও জরিমানার ধরন বিশ্লেষণে দেখা যায় অপরাধের মাত্রা ও গুরুত্ব বিবেচনায় কঠোর দণ্ডের অভাব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ- ওষুধ আইন, ১৯৪০ এ অনুমোদনহীন, ভেজাল, নকল ও মিসব্রান্ডেড ওষুধ উৎপাদন, সরবরাহ ও বিক্রয়ে সর্বোচ্চ ৩ বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা অনির্দিষ্ট করা হয়েছে। অপরদিকে ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ তে উল্লিখিত অপরাধের ক্ষেত্রে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২ লাখ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। আবার অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় শাস্তি ও দণ্ডের পরিমাণে অসামঞ্জস্যতা লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ- ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ তে সরকারি ওষুধ চুরির ক্ষেত্রে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২ লাখ টাকা জরিমানার বিধান এবং ভেজাল, নকল ও মিসব্রান্ডেড ওষুধ উৎপাদন, সরবরাহ ও বিক্রয়েও সমপরিমাণ শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। আইনে কঠোর দণ্ডের অভাব এবং শাস্তি ও দণ্ডের পরিমানে অসামঞ্জস্যতার কারণে একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ও স্থায়ীভাবে অপরাধ দমনে ব্যর্থতা তৈরি হয়।

সারণি ৩.১: ওষুধ আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি ও দণ্ডের শাস্তির পরিমাণ

অপরাধের ধরন	ওষুধ আইন, ১৯৪০	ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২
অনুমোদনহীন,ভেজাল, নকল ও মিসব্রান্ডেড ওষুধ উৎপাদন, সরবরাহ ও বিক্রয়	তিন বছর কারাদণ্ড ও জরিমানা অনির্দিষ্ট	দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও দুই লক্ষ টাকা
অনুমোদনহীন ওষুধ আমদানি ও আমদানিকৃত ওষুধ নকল, ভেজাল ও মিসব্রান্ডেড হলে	এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা	তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা
নিম্নমানের ওষুধ তৈরি, আমদানি, সরবরাহ ও বিক্রয়	তিন বছর কারাদণ্ড ও জরিমানা অনির্দিষ্ট	পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও এক লক্ষ টাকা
ওষুধ ও আমদানিকৃত কাঁচামাল বেশি দামে বিক্রয়	উল্লেখ নাই	দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও দশ হাজার টাকা
সরকারি ওষুধ চুরি	উল্লেখ নাই	দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও দুই লক্ষ
ওষুধের অবৈধ বিজ্ঞাপন	৫০০ টাকা	তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও দুই লক্ষ
মিথ্যা ওয়ারেন্টি বা ওয়ারেন্টির অপব্যবহার	এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা	উল্লেখ নাই
ফুটপাত বা রাস্তায় ওষুধ বিক্রি	জরিমানাসহ দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ড	উল্লেখ নাই

[২৬] সংবিধানের ৪০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতা সম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের এবং যে কোন আইরসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার অধিকার থাকিবে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় বাংলাদেশে ওষুধ নিয়ন্ত্রণে ওষুধ আইন, ১৯৪০ ও ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এর কিছু ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য থাকলেও এ আইন দু'টির সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ লক্ষণীয়। এ দু'টি আইন দীর্ঘদিন যাবৎ ওষুধ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমসাময়িক বিষয় ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথেষ্ট নয়। এছাড়া আইন দু'টিতে কিছু বিষয় সুস্পষ্ট ও এর প্রয়োগে যথাযথ নীতিমালা না থাকায় ওষুধের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যহত হয় বিশেষত, দু'টি আইনেই মেডিকেল ডিভাইস, ফুড সাপ্লিমেন্ট ও কসমেটিকস সামগ্রির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভূক্ত না করা, ওষুধের অযৌক্তিক ও অপব্যাবহার রোধে ব্যবস্থাপত্র বিষয়ে উল্লেখ না থাকা, কিছু অপরাধের সুনির্দিষ্ট দণ্ডের উল্লেখ না থাকা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কঠোর দণ্ডের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। অপরদিকে, সমন্বিত একক আইনের অনুপস্থিতির দরুণ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে যেমন দ্বৈততা ও স্বেচ্ছাচারিতার ঝুঁকি সৃষ্টি করে তেমনি বিধিমালা তৈরি ও হালনাগাদ না হওয়ার কারণে বিভিন্ন বিষয়ে আইনের অস্পষ্টতা তৈরি হয়। ফলস্বরুপ, ওষুধ আইনের বিধান লঙ্ঘনকারীরা খুব সহজে আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে পার পেয়ে যায় এবং নকল, ভেজাল ও মানহীন ওষুধ উৎপাদনে উৎসাহিত হয়। একইভাবে, আইনে ওষুধ প্রশাসন সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোর গঠন ও কর্ম প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন বিষয়ে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারির সময় (বিশেষত:ওষুধের মূল্য নির্ধারণ) উল্লেখ না থাকায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওষুধ আইনের সুফল পাওয়া যায় না এবং সার্বিকভাবে কার্যকরভাবে ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাঁধাগ্রস্ত হয়।

অধ্যায়ঃ চার

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা, সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

নিরাপদ ও মানসম্মত ওষুধ নিশ্চিত করা প্রতিটি রাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্যের একটি অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত। এ লক্ষ্যে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণ, তদারকি এবং এ সংক্রান্ত আইন ও বিধিসমূহ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে একটি বিশেষায়িত সংস্থা কাজ করে থাকে (যেমনঃ ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)। বাংলাদেশে ওষুধ তদারকি ও এ সংক্রান্ত আইন ও বিধিসমূহ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কাজ করে থাকে। এ অধ্যায়ে উল্লিখিত দায়িত্ব পালনে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা, সীমাবদ্ধতা এবং চ্যালেঞ্জ আলোচনা করা হয়েছে।

৪.১ অবকাঠামোগত সমস্যা

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে অবকাঠামোগত সমস্যা বিদ্যমান। অধিদপ্তরের কেন্দ্রিয় কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের অফিসের জন্য নিজস্ব কোনো অফিস ভবন নেই। জেলা পর্যায়ের কার্যালয়গুলো ভাড়া করা ভবনে অবস্থিত। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে চাহিদা অনুযায়ী কার্যালয়ের অভাব রয়েছে। বর্তমানে ৬৪টি জেলার তদারকিতে কেন্দ্রিয় কার্যালয়সহ মোট ৫২টি জেলায় অফিস রয়েছে। এরফলে কার্যালয়বিহীন জেলাগুলোতে তদারকি কার্যক্রম ব্যহত হয়। অপরদিকে প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোতে জায়গার অপ্রতুলতা রয়েছে। পর্যাপ্ত জায়গার অভাবে সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনা যেমন- অফিস ফাইল ও নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণ, ওষুধের নমুনা সংরক্ষণ ও সেবাগ্রহীতাদের সেবাপ্রদানে সমস্যা হয়। উল্লেখ্য সম্প্রতি ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ঢাকা কেন্দ্রিয় কার্যালয়ের ভবন নির্মানের কাজ শুরু হয়েছে।

৪.২ তদারকি ও পরিদর্শনে প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস ঘাটতি

ওষুধের বাজার পরিবীক্ষণ ও তদারকিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ওষুধ তত্ত্বাবধায়ক ও পরিদর্শকদের প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস যেমন- মাঠ পর্যায়ে ওষুধের নমুনা সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবহনের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। কেন্দ্রিয় কার্যালয়ে মহাপরিচালকসহ তিনজন পরিচালকের জন্য সর্বমোট পাঁচটি গাড়ি আছে, এর মধ্যে দুইটি গাড়ি মহাপরিচালক ব্যবহার করেন এবং বাকি তিনটি গাড়ি তিনজন পরিচালকের যাতায়াত ও বাজার পরিদর্শনে ব্যবহৃত হয়। মাঠ পর্যায়ে যানবাহন হিসেবে জেলা অফিসগুলোতে সরবরাহকৃত মোটর সাইকেলগুলোর বেশিরভাগই ৮-১০ বছর ধরে নষ্ট হয়ে পড়ে আছে এবং বর্তমানে তা ব্যবহারের অনুপযুক্ত। কেন্দ্রিয় ও মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজন অনুযায়ী যানবাহনের অভাবে ওষুধের বাজার কার্যক্রম ব্যহত হয়ে থাকে। সাধারণত কোনো কোম্পানি পরিদর্শনে ওষুধ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্ট কোম্পানির পরিবহন ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করতে হয়। কর্মকর্তাদের তথ্যানুযায়ী, নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা না থাকলে একজন কর্মকর্তার মনোবল কমে যায়। যখন তারা কোনো কোম্পানির গাড়ি ব্যবহার করে পরিদর্শনে যান তখন উক্ত কোম্পানির কিছু বিষয় তারা চেপে যেতে বাধ্য হয়। সার্বিকভাবে কোম্পানি পরিদর্শনে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির পরিবহন ব্যবস্থার ওপর নির্ভর হলে কর্মকর্তা ও কোম্পানির মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ তৈরী হয় এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির সূযোগ তৈরী হয়।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে মাঠ পর্যায়ে ওষুধের নমুনা সংগ্রহ ও এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবহন ব্যবস্থার অভাবে কেন্দ্রিয় পরীক্ষাগারে প্রেরণকৃত নমুনার কিছু অংশ পরীক্ষার অনুপযুক্ত হয়। অপরদিকে ওষুধ তত্ত্বাবধায়কদের দাপ্তরিক কাজে জেলা কার্যালয় হতে প্রতিনিয়ত প্রধান কার্যালয়ে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। যোগাযোগের জন্য জেলা পর্যায়ের অফিসগুলোতে টেলিফোন এবং ফ্যাক্স সুবিধার অভাব রয়েছে, বিশেষ করে ১৯৯৪ সালের পর প্রতিষ্ঠিত নতুন অফিসগুলোর কোনোটিকেই সরকারি টেলিফোন ও ফ্যাক্সের সুবিধা নেই। এ সকল অফিসে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কর্মকর্তারা ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু মোবাইল ফোন ব্যবহারের জন্য ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর হতে কোনো ধরনের বিল দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। আবার দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনায় কেন্দ্রিয় অফিসসহ জেলা অফিসগুলোতে কম্পিউটার সরবরাহ করা হলেও এগুলোর ব্যবহারে অভাবে অনেক অফিসেই অকার্যকর হয়ে পড়ে আছে।

৪.৩ জনবলের স্বল্পতা ও সমস্যা

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্ম এলাকা দেশের ৬৪টি জেলার সকল উপজেলা ও থানা পর্যায়ে ব্যপৃত। কিন্তু কাজের পরিধি ও ভৌগলিক আওতা বিবেচনায় এ অধিদপ্তরের জনবল স্বল্পতা লক্ষণীয়। জনবল স্বল্পতার কারনে জেলা পর্যায়ের অফিসগুলোর মাঠ পরিদর্শন ও বাজার তদারকি কার্যক্রম ব্যহত হয়। দেশের ৬৪টি জেলার প্রতিটিতে কমপক্ষে ১ জন করে ওষুধ তত্ত্বাবধায়ক ও ১ জন ওষুধ পরিদর্শক থাকা প্রয়োজন অথচ ঢাকার কেন্দ্রিয় অফিসসহ মাঠপর্যায়ে বর্তমানে ৫৮ জন ওষুধ তত্ত্বাবধায়ক ও ৪ জন ওষুধ পরিদর্শক কর্মরত রয়েছে। গবেষণায় পর্যবেক্ষণে দেখা যায় ৫৮ জন ওষুধ তত্ত্বাবধায়কের মধ্যে ৭ জন ঢাকার কেন্দ্রিয় কার্যালয়ে কর্মরত রয়েছে অর্থাৎ মাঠ পর্যায়ে প্রকৃতপক্ষে ওষুধ তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে ৫১ জন। জেলা পর্যায়ের অফিসগুলোতে সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নূন্যতম ৬ জন লোক থাকা দরকার কিন্তু বর্তমানে প্রতিটি অফিসে মাত্র ২/৩ জন করে জনবল কর্মরত আছে। অধিদপ্তরে উন্নীত হওয়ার পর প্রায় ৪ বছর অতিবাহিত হলেও এখনও পর্যন্ত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী সকল পর্যায়ে জনবল নিয়োগ হয়নি। পরিচালকের অনুমোদিত পদ হচ্ছে ৪টি কিন্তু এখনও পর্যন্ত এ পদে চূড়ান্তভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। বর্তমানে তিনজন উপপরিচালক পদমর্যাদার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পরিচালকের চলতি দায়িত্ব পালন করছেন। সার্বিকভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে বর্তমানে অনুমোদিত পদের বিপরীতে ৫৪ শতাংশ পদ শুন্য রয়েছে।

সরকারিভাবে ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অধীনে দু'টি ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরী আছে। এর মধ্যে একটি ঢাকার মহাখালি ও অন্যটি চট্রগ্রামে অবস্থিত। ২০১১ সালে ঢাকায় পুন:প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগারের অর্গানোগ্রাম এখনও পর্যন্ত অনুমোদন হয়নি। পুরানো পরীক্ষাগারের অপ্রতুল জনবল দ্বারা এ পরীক্ষাগারের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। অপরদিকে কেন্দ্রীয় ওষুধ পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম এ ২০টি টেকনিক্যাল পদের বিপরীতে মাত্র ৫ জন কর্মরত রয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় জনবলের স্বল্পতায় ওষুধ প্রশাসন প্রতি বছর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ওষুধের বাজার তদারকি করতে ব্যর্থ হয় এবং ওষুধ পরীক্ষাগারে প্রয়োজনীয় জনবলের ঘাটতির কারনে দেশের বাজারের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক (প্রতিবছর প্রায় ৭০ শতাংশ) ওষুধের মান পরীক্ষা করতে ব্যর্থ হয়।

ওষুধ তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগবিধিতে ফার্মেসি, ফার্মাকোলজি, অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি, বায়োকেমিস্ট্রি, মাইক্রোবায়োলজি বিষয়ের পাশাপাশি ভেটেরিনারি সায়েন্সও অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। বাংলাদেশের ওষুধের বাজারে বর্তমানে অ্যালোপ্যাথি, ইউনানি, আয়ুর্বেদিক, হারবাল ও হোমিওপ্যাথি একটি বড় অংশ দখল করে রয়েছে। এ সকল ওষুধের উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ, মানের নিশ্চয়তাবিধান, রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স ইত্যাদি কাজে ভেটেরিনারি সায়েন্স গ্রাজুয়েটদের তুলনায় উল্লিখিত অন্যান্য বিষয়গুলো হতে নিয়োগকৃতরা সবচেয়ে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে পারে। কিন্তু গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় বর্তমানে নিয়োগপ্রাপ্ত ওষুধ তত্ত্বাবধায়কদের একটি বড় অংশ ভেটেরিনারি সায়েন্স হতে নেওয়া হচ্ছে। এরফলে নিয়োগপ্রাপ্ত ওষুধ তত্ত্বাবধায়কদের মধ্যে অনেকেই ওষুধ নিয়ন্ত্রণে কাঙ্খিত ভূমিকা পালন করতে পারে না।

৪.৪ কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের ঘাটতি

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে কেন্দ্রিয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ে জনবলের পেশাগত দক্ষতার ঘাটতি লক্ষণীয়। ওষুধ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের তথ্যানুযায়ী, ওষুধ তত্ত্বাবধায়কদের জন্য নিয়মিতভাবে কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। এর ফলে তাদের অধিকাংশই ওষুধের বাজারের সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ, প্রশাসনিক চলতি দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে সচেতন হতে পারে না এবং তাদের মধ্যে ওষুধের বাজার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ওষুধ প্রশাসনের বিদ্যমান আইনকানুন সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। আবার কর্মকর্তাদের জন্য নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা না থাকায় তাদের মধ্যে অনেকেরই আচরন, দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। অপরদিকে ক্ষেত্রবিশেষে প্রশিক্ষণ পাওয়ার ক্ষেত্রে পদসংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের চাহিদা ও গুরুত্ব বিবেচনা করা হয় না। ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরীতে বর্তমানে কর্মরত জনবলের বিশেষ করে টেকনিশিয়ানদের অধিকাংশেরই ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণ ও ওষুধের বিভিন্ন উপাদান পরীক্ষার বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব রয়েছে। উল্লেখ্য সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়নে অধিদপ্তরের কিছু কর্মকর্তাকে গুড ম্যানুফেকচারিং প্রাকটিস(জিএমপি) বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

৪.৫ তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রতিবেদন প্রস্তুতে দুর্বলতা

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সেবা সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষণীয়। এ প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রিয় ও মাঠ পর্যায়ে তথ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ও একক পদ্ধতি (যেমন-এমআইএস) অনুসরণ করা হয় না। এর ফলে অধিদপ্তরের প্রতিবেদন প্রণয়ন ও নথি ব্যবস্থা দুর্বল হয় এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রেরিত প্রতিবেদনের তথ্য ব্যবস্থাপনায় সমস্যা ও অপূর্ণতা থাকে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোর মধ্যে রিপোর্টিং ফরমেটে পার্থক্য রয়েছে। এছাড়া ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে অধিদপ্তরের সেবা সংক্রান্ত তথ্যের ঘাটতি ও সন্নিবেশিত তথ্য হাল নাগাদ না হওয়া লক্ষণীয়। এ কারণে সেবাগ্রহীতারা বিশেষ করে ওষুধ কোম্পানিগুলো অনেকসময়ই প্রয়োজনীয় (ওষুধ অনুমোদন ও বাতিল সংক্রান্ত তথ্য,

কারখানা পরিদর্শণ সংক্রান্ত তথ্য, কমিটিতে বিভিন্ন আবেদনের অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি) ও হালনাগাদ তথ্যপ্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়।

৪.৬ কর্মবন্টনে স্বচ্ছতার ঘাটতি

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্য-নির্বাহী প্রধান হচ্ছেন মহা-পরিচালক। মহা-পরিচালকসহ ৪জন পরিচালকের নেতৃত্বে ৩৭০ জনবল কাঠামো দ্বারা ওষুধ প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী দায়িত্ব বন্টনের কাঠামো তৈরী করা হলেও এখনো তা কার্যকর করা হয়নি এবং এক্ষেত্রে অত্র অধিদপ্তরে বিভিন্ন সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালক বা মহাপরিচালক তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ বিভাজন করে থাকে। কর্মবন্টনে স্বচ্ছতার ঘাটতির কারনে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে কোম্পানি পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণে অনিয়ম লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু কর্মকর্তা তাদের পছন্দ অনুযায়ী অর্থাৎ 'সুইট অক্ষর' দ্বারা কোম্পানি নির্বাচন করে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় ও ছোট কোম্পানির দায়িত্ব গ্রহণে প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও যোগসাজস হয়ে থাকে। আবার কিছু ওষুধ কোম্পানি কর্তৃক তাদের পছন্দনীয় কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদানের জন্যও প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এরফলে সমঝোতামূলক দুর্নীতির সূযোগ সৃষ্টি ও দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ঝুঁকি তৈরি হয়। সার্বিকভাবে এ ধরনের ব্যবস্থা চালু থাকায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের জবাবদিহি ব্যবস্থা দুর্বল হয় এবং দায়িত্ব বন্টনের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীন গ্রুপিং তৈরীর সূযোগ সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য বিভিন্ন সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালক বা মহাপরিচালকের ইচ্ছানুযায়ী কাজ বিভাজনের কারণ হিসেবে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর হতে অফিসের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সময়মত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে পেশাগত শিক্ষা ও দক্ষতার বিবেচণায় স্বাভাবিকভাবেই দায়িত্ব বন্টন করা হয় বলে উল্লেখ করা হয় এবং এক্ষেত্রে মহাপরিচালক প্রভাবমুক্তভাবে কর্মকর্তাদের দক্ষতা. অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্ব বন্টন করেন বলে উল্লেখ করে। কিন্তু অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ ও অংশীজনের মতে বিভিন্ন সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত মহাপরিচালক বা পরিচালক কর্তৃক এ নিয়ম চালু করার কারণে তাদের পছন্দনীয় কর্মকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদানে সচেষ্ট থাকে যা অধিদপ্তরে এক ধরণের গ্রুপিং তৈরির সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে।

৪.৭ কর্মকর্তাদের পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহিতার ঘাটতি

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে বিভিন্ন সময়ে পরিচালক এবং মহাপরিচালক কর্তৃক ইচ্ছানুযায়ী কর্মবন্টন ব্যবস্থা চালু থাকায় কর্মী ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এর ফলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ওষুধ তত্ত্বাবধায়কদের নিয়মিত মনিটরিং ও জবাবদিহিতা কাঠামো অনেকসময় অকার্যকর হয়ে থাকে। মাঠ পর্যায়ে নিয়ম অনুযায়ী সপ্তাহের পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে নূন্যতম দুই দিন পরিদর্শনে যাওয়ার বিধান থাকলেও সকলক্ষেত্রে তা পালন করা হয় না এবং কিছু ওষুধ তত্ত্বধায়ক নিয়মিত দোকান পরিদর্শন না করে রিপোর্ট প্রদান করে। আবার মাঠ পর্যায়ের কোনো কোনো তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক নিজ কর্মস্থলে নিয়মিত উপস্থিত না থেকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ ও প্রশাসনিক কার্য সম্পাদন করার অভিযোগ রয়েছে। অনেকক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ বিষয়ে জ্ঞাত থাকলেও দুর্বল জবাবদিহি কাঠামোর কারনে কোনো ব্যবস্থা গ্রহন করে না। অপরদিকে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কিছু কর্মকর্তা সরকারী চাকুরীর নিয়ম ভঙ্গ করে কোনো কোনো কোম্পানির পরামর্শক হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করে। এরফলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত কোম্পানীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশাসনিক প্রভাব বিস্তার করে। আবার এ ধরণের কোম্পানির কোনো কার্যক্রম আইন বিরোধী হলেও কর্মকর্তাদের প্রভাবে কোনো প্রকার ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় না। পরামর্শক হিসেবে এ ধরণের অনৈতিক দায়িত্ব পালন করায় কিছু সৎ ও উদ্যমী কর্মকর্তাদের মধ্যে অসন্তোষ ও দায়িত্ব পালনে অনিহা তৈরি হয় এবং সর্বোপরি ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহি কাঠামো দুর্বল করে।

বক্স: ওষুধ প্রশাসনের একজন কর্মকর্তার দ্বায়িত্বে অবহেলা

১৯৯২ সালের ২ নভেম্বর ও ৩ ডিসেম্বর ওষুধ প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা যথাক্রমে বিসিআই এবং অ্যাডফ্লেম ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির বিরুদ্ধে ভেজাল প্যারাসিটামল উৎপাদনের অভিযোগ দায়ের করেন। আদালতের নথি অনুযায়ী ওই কর্মকর্তাকে বিসিআই এর অভিযোগের প্রেক্ষিতে ৫ বার প্রমানসহ কোর্টে হাজির হওয়ার আদেশ দেওয়া হলেও তিনি কোর্টে হাজির হননি। এরফলে উক্ত অভিযোগ স্থগিতাদেশপ্রাপ্ত হয় এবং বিচারিক প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা তৈরি করে। এই স্থগিতাদেশ ৩০ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে আদালত পাঁচবার সমন জারি করে। কিন্তু উক্ত কর্মকর্তা ২০১২ সালের ২৭ অক্টোবর একবার সমন পাওয়ার কথা স্বীকার করলেও আদালতে উপস্থিত হননি। অপরদিকে অ্যাডফ্লেম ফার্মাসিউটিকাল কোম্পানির বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২০১০ এ আদালতে বিস্ময়কর ভাবে উক্ত কর্মকর্তা কোম্পানির পক্ষে বক্তব্য দান করেন। এর মধ্যে উৎপাদনকারির নাম ভুলে যাওয়া, নমুনা সংগ্রহের স্থান হিসেবে অভিযোগপত্রের সাথে আদলতে দেওয়া বক্তব্যের অমিল ছিল লক্ষণীয়। অথচ উক্ত কর্মকর্তা ১৯৯২ সালে অভিযুক্ত কারখানা হতে নমুনা সংগ্রহ করে ড্রাগ টেষ্টিং ল্যাবরেটরি এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণাগারে নমুনা প্রেরণ করে এবং যেখানে এ কারখানায় তৈরিকৃত প্যারাসিটামলে প্রাননাশক ডাইইথালিন গ্লাইকল এর উপস্থিতি পাওয়া যায়। ২০১৪ সালের ২১ জুলাই অর্থাৎ দীর্ঘ ২১ বছর পর অ্যাডফ্লেম ফার্মাসিউটিকাল কোম্পানির এ মামলাটির রায় হয় যেখানে আদালত কর্তৃক উক্ত কোম্পানি ব্যবস্থাপকসহ তিনজনকে ১০ বছর কারাদণ্ড ও ২ লাখ টাকা জরিমানা আদায়ের আদেশ দেওয়া হয়।

৪.৮ মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহনে দীর্ঘসূত্রতা

আইন অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ যেমন- কোন কারখানা পরিদর্শণ, কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং সন্দেহ হলে তল্লাসি ও কোন প্রকার অসঙ্গতি দেখলে তাৎক্ষনিক উপকরণ বাজেয়াপ্ত এবং কারখানা বন্ধ করে দেওয়া সহ আইননানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা ওষুধ পরিদর্শককে প্রদান করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, বাস্তবে তত্ত্বাবধায়ক/পরিদর্শকগণ কারখানা বা দোকানের বিরুদ্ধে কোনো ব্যাবস্থা গ্রহণের পূর্বে তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মহা-পরিচালকের উপর নির্ভরশীল। অনেক ক্ষেত্রে, মহা-পরিচালকের ব্যস্ততার জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহনে সময়ক্ষেপণ হয়। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক প্রভাবও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা ও বাঁধার সৃষ্টি করে যা অনেক ক্ষেত্রে সংক্ষুব্দ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আলামত নষ্ট করার সুযোগ তৈরি করে। সর্বোপরি দীর্ঘসূত্রতা এবং বিভিন্ন অনিয়মের কারণে ড্রাগ কোর্টে মামলা করতে সময়ক্ষেপন হয়। অনেকক্ষেত্রে কার্যকর আলামতের কারনে এ সকল মামলা হতে সংক্ষুব্দ ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান খুব সহজে দায় হতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। অপরদিকে সদর কার্যালয় হতে বিভিন্ন হালনাগাদ তথ্য যেমন- ওষুধ বা কারখানার নিবন্ধন বাতিলের তথ্য নিয়মিত ভাবে মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ করা হয় না, যার ফলে তত্ত্বাবধায়কগন এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকে না। এ সুযোগে কোনো কোনো অভিযুক্ত কোম্পানি তাদের উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।

৪.৯ মার্কেট রেগুলেশনে পুলিশের সহযোগিতার ঘাটতি

ওষুধ প্রশাসন কর্তৃক মার্কেট রেগুলেশনে জরুরী মূহুর্তে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশী সহযোগীতার ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময়ই মার্কেট তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ওষুধ পরিদর্শকগণ প্রয়োজন মতো পুলিশী সহযোগীতা পান না এবং পুলিশী সহায়তা না পাওয়ার কারনে তারা বাজার পরিদর্শনে বের হতে পারে না। প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশী সহায়তার অভাবে বাজার পরিদর্শনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার ঝুঁকি লক্ষণীয়। অনেকসময় ওষুধ তত্ত্বাবধায়ক বা পরিদর্শককে ওষুধের দোকান মালিক ও ব্যবসায়ীরা ঘেরাও করে এবং তাদের কার্যক্রমে বাধার সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে টিমের সাথে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ সদস্য না থাকলে তারা আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয় এবং বাজার পরিদর্শন কার্যক্রম ব্যহত হয়। উল্লেখ্য কোন জরুরী মুহূর্তে মাঠ পরিদর্শনে তাৎক্ষণিক পুলিশের সহায়তা দরকার হলে ওষুধ পরিদর্শকগণ স্থানীয় থানায় গিয়ে পুলিশের সহযোগিতা চাইলে কর্মকর্তা তাদেরকে তিন চার দিন আগে জানাতে বলেন।

৪.১০ নিজস্ব আইনজীবী না থাকা এবং আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে প্রভাব বিস্তার

ওষুধ আইনের বিধান লঙ্ঘনজণিত মামলা পরিচালনার জন্য ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের নিজস্ব বা চুক্তিভিত্তিক আইনজীবী নেই। এক্ষেত্রে ওষুধ তত্ত্বাবধায়কদের কোর্টে মামলা করার পর পিপি'র (পাবলিক প্রসিকিউটর) ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু অনেকসময় দেখা যায় মামলার মধ্যবর্তী পর্যায়ে পিপি পরিবর্তন হয় এবং এরফলে মামলা পরিচালনায় দীর্ঘসূত্রতা তৈরী হয়। আবার অনেকক্ষেত্রে পিপি নানা ধরণের সরকারি মামলা পরিচালনায় ব্যস্ত থাকার কারনে তার পক্ষে গুরুত্ব সহকারে যুক্তি তর্ক উপস্থাপন সম্ভব হয় না। এর ফলে তিনি বিবাদী পক্ষের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পেশাদার আইনজীবীর সাথে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনে সফল হতে পারে না এবং সার্বিকভাবে ওষুধ আইনের বিধান লঙ্ঘনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় না এবং অপরাধ করার পরও ছাড়া পেয়ে যায়। আবার আাইনি ব্যবস্থা গ্রহণ ও মামলা পরিচালনা কার্যক্রমে ওষুধ তত্ত্বাবধায়কদের ওপর স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতিবিদ, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রভাবশালী ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী সংগঠন প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাদেরকে অনেকসময় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে গেলে শারীরিক ও মানসিকভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়। কিছুসংখ্যক ওষুধ তত্ত্বাবধায়ক এ সকল ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমঝোতামূলক অনিয়ম ও দুর্নীতিতে যোগসাজস করে থাকে।

৪.১১ ড্রাগ আদালতের কার্যকরতার ঘাটতি

ওষুধ আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে **১৯৮২** সালের ওষুধ অধ্যাদেশ অনুযায়ী সারাদেশের প্রতিটি জেলায় ড্রাগ আদালত গঠনের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু দেশের কোথাও পৃথকভাবে ড্রাগ আদালত গঠন করা হয়নি। বর্তমানে প্রতিটি জেলা ও দায়রা জজ আদালত অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে ড্রাগ আদালতের বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে ড্রাগ আদালতের বিচার কার্যক্রম প্রায় স্থবির ও খুবই ধীরগতি সম্পন্ন। এছাড়া অধিদপ্তর হতে পর্যাপ্ত মামলা না পাঠানোর ফলে ড্রাগ আদালতে প্রায় মামলা শূণ্যতা লক্ষ্যণীয়। এর কারণ হিসেবে দেখা যায় ড্রাগ আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ওষুধ প্রশাসনে অভিযোগ আসলে তার তদন্ত ধীর গতিতে করা হয় এবং সেগুলো আদালতে পেশ করা হয় না। এছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রাপ্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ড্রাগ আদালতের কার্যকরতার প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে যেসব কারণ লক্ষ্য করা যায় তা হলোঃ দুর্বল আইন দিয়ে ড্রাগ মামলা পরিচালিত হয়। এর ফলে আইনের ফাঁক ফোঁকর দিয়ে ড্রাগ আইন লঙ্ঘনকারীরা বের হয়ে যায়। ড্রাগ অধ্যাদেশের ২২(এ) ধারা অনুযায়ী লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ অথবা ওষুধ প্রশাসন কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মামলা করার ক্ষমতা নেই। সাধারণত কোনো অভিযোগ আসলে সংশ্লিষ্ট ড্রাগ ইন্সপেক্টর সরজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রতিবেদন

ওষুধ প্রশাসনের মাধ্যমে আদালতে পাঠানো হয়। এই অধ্যাদেশে আরো বলা হয়েছে যে পুলিশ মামলা নিলেও ড্রাগ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া আদালত মামলার বিচার কাজ করতে পারবে না।

৪.১২ ঔষধ প্রশাসন সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোর কার্যকরতার ঘাটতি

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১০টি কমিটি সহায়তা প্রদান করে। জেলা ড্রাগ লাইসেন্সিং কমিটি ব্যতীত বাকি নয়টি কমিটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় গঠন করে থাকে[২৭]। এই কমিটিগুলো মূলত ওষুধ খাতের বিভিন্ন বিষয়ের কার্যকর ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলোর সার্বিক কার্যক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায় অনেকক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর হতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশণার অভাবে কমিটিগুলো দায়িত্ব কার্যকরভাবে পালন করতে পারে না। এছাড়া কমিটিগুলোর কার্যকরতার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যাও লক্ষণীয়, যেমন- নতুন পুন:গঠিত অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়েকশন অ্যাডভাইজরী কমিটি ব্যতীত বাকি কমিটিগুলোর সভা অনুষ্ঠানের সময়কাল ও বাধ্যবাধকতা উল্লেখ না করা, কমিটিগুলোর গঠন প্রক্রিয়ায় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার গাইড লাইন অনুসরণ না করা, কমিটিগুলোতে ওষুধ শিল্প সমিতির প্রতিনিধিদের আধিপত্য বিস্তার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ,কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন সদস্যের অভাব এবং সভায় কার্যক্রম পরিচালনায় স্বচ্ছতার অভাব উল্লেখযোগ্য। নিম্নে এ কমিটিগুলোর কার্যকরতার ক্ষেত্রে সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ আলোচনা করা হলো-

৪.১২.১ কমিটিগুলোতে ওষুধ শিল্প সমিতির কিছু প্রভাবশালী প্রতিনিধিদের প্রভাব

ওষুধ সংক্রান্ত কমিটিগুলোতে ওষুধ শিল্প সমিতির কিছু প্রভাবশালী প্রতিনিধিদের আধিপত্য লক্ষণীয়। প্রায় সকল কমিটিতেই ওষুধ শিল্প সমিতির এক বা একাধিক প্রতিনিধি রয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় দশটি কমিটির মধ্যে নয়টিতেই ওষুধ শিল্প সমিতির প্রতিনিধিদের আধিপত্য রয়েছে। কমিটিগুলোতে শিল্প সমিতির আধিপত্য থাকায় সদস্যদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ কাজ করে। অনেকসময় দেখা যায় সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর মালিকই সদস্য হিসেবে তার কোম্পানির ওষুধের দাম নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। অপরদিকে কমিটিগুলোতে প্রথম শ্রেণীর খ্যাতনামা বড় কোম্পানিগুলোর প্রতিনিধিত্ব বেশি থাকে, এ ক্ষেত্রে দাম নির্ধারণ, কাঁচামাল আমদানি অথবা প্রকল্প মূল্যায়ণ সবক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব চাহিদা পূরণে সচেষ্ট থাকে যা কমিটি কর্তৃক বিভিন্ন অংশিদারিত্বমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা ব্যহত করে।

৪.১২.২ সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ

কমিটিগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেকক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কমিটি সদস্য নির্বাচনে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্কিত কোম্পানির ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করার প্রবণতা থাকে। ফলে কোন নতুন প্রকল্প অনুমোদনে বা যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দলের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং তা বাস্তবায়নে কমিটির অন্য সদস্যদের প্রভাবিত করা হয়। এছাড়া কোন কোম্পানি অথবা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ লক্ষণীয়। অনেক ক্ষেত্রে এ ধরণের হস্তক্ষেপের কারণে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ওষুধ প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না।

৪.১২.৩ কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন সদস্যের অভাব

ওষুধ প্রশাসন সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলো সাধারণত মানসম্মত ওষুধ উৎপাদন, বিক্রয়, আমদানি ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণে ওষুধ প্রশাসন কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিভিন্ন সুপারিশ প্রদান করে থাকে। ওষুধ সম্পর্কিত এ সকল মতামত ও সুপারিশ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কারিগরি জ্ঞান বিষয়ক। এ কারনে একজন নন টেকনিক্যাল ব্যক্তির পক্ষে এ সকল বিষয় সম্পর্কে মতামত ও পরামর্শ প্রদান অত্যন্ত সংবেদনশীল ও কঠিন বলে মনে করা হয়। কিন্তু ওষুধ প্রশাসন সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোর সদস্যদের প্রোফাইল বিশ্লেষণে দেখা যায়, কমিটিগুলোতে কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন সদস্যের সংখ্যা কম, যেমন- প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটিতে সদস্য হিসেবে যাদেরকে অন্তর্ভূক্ত করা হয় তাদের অনেকেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নন-টেকনিক্যাল বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ নয়। উল্লেখ্য পূর্বে গবেষণাগার প্রতিনিধি রাখা হয়েছিলো কিন্তু বর্তমানে কোনো কমিটিতে গবেষণাগার প্রতিনিধি রাখা হয়নি অথচ ওষুধ সম্পর্কিত বিভিন্ন কারিগরি বিষয় জ্ঞান সম্পন্ন সদস্য নির্বাচনে গবেষকদের গ্রহণযোগ্যতা অত্যন্ত বেশি।

৪.১২.৪ সভায় কার্যক্রম পরিচালনায় স্বচ্ছতার অভাব

[২৭] কমিটিগুলো হচ্ছে ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কমিটি, ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কমিটির টেকনিক্যাল সাবকমিটি, নতুন ওষুধ শিল্প স্থাপনের জন্য প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি, ওষুধের, মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক কমিটি,ওষুধের মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক টেকনিক্যাল সাবকমিটি, হার্বাল ওষুধ অ্যাডভাইজরী কমিটি, স্ট্যান্ডিং কমিটি ফর ইমপোর্ট অব ফার্মাসিউটিক্যালস, অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়েকশন অ্যাডভাইজরী কমিটি, অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়েকশন মনিটরিং সেল।

ওষুধ সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলো গঠনের একটি উদ্দেশ্য হলো ওষুধ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকলের সদস্যের অংশগ্রহণ এবং জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করণে প্রয়োজন প্রতিটি বিষয় সঠিকভাবে যাচাই বাছাই করা। কিন্তু কমিটিগুলোর কার্যক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে তা নিশ্চিত করা হয় না। বরং কমিটির সদস্যদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাবশালী সদস্য ও ওষুধ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। উদাহরণস্বরুপ বলা যায়, ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কমিটির একটি সভায় একই দিনে ৪১১টি এজেন্ডা উপস্থাপন করা হয়। মূখ্য তথ্যদাতাদের মতে এতগুলো এজেন্ডা একই দিনে উপস্থাপন করা হলে এক্ষেত্রে সেগুলোর প্রতিটি যাচাই বাছাই করা সম্ভব হয় না।

৪.১৩ নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সদিচ্ছার ঘাটতি

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সদিচ্ছার ঘাটতি লক্ষণীয়। ওষুধ শিল্পের ব্যবস্থাপনা ও বিকাশে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও এই প্রতিষ্ঠানটিতে দীর্ঘদিন ধরে জনবল ও অবকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। মূখ্য তথ্যদাতাদের মতে, সত্যিকার অর্থে রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে জনবল সংক্রান্ত ঘাটতি ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা গত দুই দশক ধরে অমীমাংসিত অবস্থায় থাকতো না। পরিদপ্তর হতে অধিদপ্তরে উন্নীত হওয়ার পর চার বছর অতিবাহিত হলেও এখনো পর্যন্ত অনুমোদিত জনবলের ৩৮ শতাংশ পদ শূন্য রয়েছে। অপরদিকে কাজের পরিধি ও ওষুধের বাজারের বিস্তৃতি বিবেচনায় ২০১০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক একটি মূল্যায়নে ৯৪৭টি পদের প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে এটি উপেক্ষিত হয়। উপরন্তু অধিদপ্তরে উন্নীত হওয়ার সময় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর হতে ৫৭০টি পদের চাহিদাও নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে উপেক্ষিত হয়। জনবল সমস্যা উপেক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে ওষুধ প্রশাসন সংশ্লিষ্ট অংশিজনের অনেকেই নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের সদিচ্ছার ঘাটতিকে দায়ি করেন। এছাড়া ওষুধ পরীক্ষাগারের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের বাজেট বরাদ্দ এখনও পর্যন্ত জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের আওতায় রাখা হয়েছে, অথচ এটি বর্তমানে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের আওতাধীন রয়েছে। এর ফলে বর্তমানে ওষুধ পরীক্ষাগারের বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে চাহিদা অনুযায়ী রিএজেন্ট ক্রয়ে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এছাড়া এ অধিদপ্তরের বাজেট বিশ্লেষণে দেখা যায়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য অনুমোদিত বাজেটের গড়ে মাত্র ০.১৮ শতাংশ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের জন্য ব্যয় করা হয় এবং এ বাজেটের বেশিরভাগই খরচ হয় অনুন্নয়ন ব্যয়ে। কিন্তু উন্নয়ন খাতে ব্যয় বরাদ্দ কম। ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে এই অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দ এ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা আনয়নে একটি বড় অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। অপরদিকে ওষুধ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিতে বিদ্যমান আইনসমূহে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। এছাড়া বর্তমান আইন দু'টি সমসাময়িক বিষয় ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথেষ্ঠ নয়। কিন্তু এ বিষয়ে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগের অভাব রয়েছে। এক্ষত্রে ১৯৪০ সালের ওষুধ আইনের বিধিমালা হালনাগাদ না করা এবং ১৯৮২ সালের ওষুধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশের বিধিমালা তৈরি না করা লক্ষণীয়। ঔষধ প্রশাসন সংশ্লিষ্ট সবগুলো কমিটিতেই (বিশেষত: প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি, ড্রাগ কন্ট্রোল কমিটি, মূল্য নির্ধারণ কমিটি, ড্রাগ কন্ট্রোল টেকনিক্যাল সাব কমিটি) নীতি নির্ধারণী পর্যায় হতে ওষুধ শিল্প সমিতির এক বা একাধিক প্রতিনিধি রাখা হয়েছে। পূর্বে কোনো কমিটিতে ওষুধ শিল্প সমিতির এত বেশি প্রতিনিধি ছিল না, কারণ এতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। এক কোম্পানির মালিক আরেকটি কোম্পানির প্রকল্প মূল্যায়ন করছে কিন্তু তারা ওষুধের বাজারে একে অপরের প্রতিযোগী। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটিতে কিছু ওষুধ কোম্পানির প্রভাবশালী প্রতিনিধিদের অনৈতিক প্রভাব এ অধিদপ্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে ওষুধ বাজার সম্প্রসারনের সাথে সাথে জাতীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে নানবিধ প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জের কারনে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর তার কাঙ্খিত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। পরিদপ্তর হতে অধিদপ্তরে উন্নীত হওয়ার পর এখনও পর্যন্ত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবল নিয়োগ না হওয়া, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও লজিস্টিকস এর অভাবে সার্বিকভাবে সম্প্রসারিত ওষুধের বাজার নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন সমস্যা ও অনিয়ম যেমন- কর্মবন্টনে স্বচ্ছতার ঘাটতি এবং অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী দায়িত্ব বণ্টন না করার দরুণ পদসোপান পদ্ধতি অকার্যকর হওয়ার কারনে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা কাঠামো দুর্বল হিসেবে প্রতীয়মান হয় যা কেন্দ্রিয় ও মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় প্রভাব বিস্তার করে। অপরদিকে ওষুধ প্রশাসনের কার্যক্রম পরিচালনায় জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোতে ওষুধ শিল্প সমিতির প্রতিনিধিদের আধিপত্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন সদস্যের অভাব, সভায় কার্যক্রম পরিচালনায় স্বচ্ছতার অভাব ও স্বার্থের দ্বন্দ কার্যত কমিটিগুলোর কার্যকরতার ঘাটতি নির্দেশ করে। একই সাথে নিজস্ব আইনজীবি না থাকার দরুণ ওষুধ সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলা পরিচালনায় দীর্ঘসূত্রতা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যার্থ হয়। উপরোক্ত সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার কারণে ওষুধ প্রশাসনের সেবা কার্যক্রম যেমন ব্যহত হচ্ছে তেমনি অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সূযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

অধ্যায়ঃ পাঁচ

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতি

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সেবা কার্যক্রমের অংশীজন মূলত: ওষুধ শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং খুচরা ও পাইকারী ওষুধের দোকান। এ অধিদপ্তরের আওতায় নিবন্ধিত মোট ওষুধ কোম্পানির সংখ্যা ৮৫৪টি, এর মধ্যে অ্যালোপ্যাথিক কোম্পানির সংখ্যা ২৭৩টি[২৮]। এছাড়া ১,১২,২১৮টি নিবন্ধিত খুচরা ও পাইকারি ওষুধের দোকান আছে[২৯]। ওষুধ প্রশাসন এ সকল ওষুধ কোম্পানি ও ওষুধের দোকানের পরিবীক্ষণ ও তদারকিসহ তাদেরকে আইনানুগ ব্যবসা পরিচালনা ও ব্যবসার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সেবা প্রদান করে। এ গবেষণায় শুধুমাত্র অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ কোম্পানি এবং খুচরা ও পাইকারি ওষুধের দোকান কর্তৃক গৃহীত সেবা কার্যক্রমের অনিয়ম ও দুর্নীতি আলোচনা করা হয়েছে।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সেবা কার্যক্রম

ওষুধ কোম্পানির ক্ষেত্রে

- কারখানা স্থাপনের নতুন প্রকল্পের প্রস্তাবনা মূল্যায়ন
- ওষুধের নিবন্ধন প্রদান ও নবায়ন
- নমুনা পরীক্ষা ও মান নিয়ন্ত্রণ
- মূল্য নির্ধারণ
- উৎপাদন কারখানা পরিদর্শন
- ব্লক লিস্ট অনুমোদন
- রেসিপি অনুমোদন
- ওষুধের ফয়েল, ইনসার্ট, লেবেল এবং মোড়ক অনুমোদন
- লিটারেচার অনুমোদন
- উৎপাদন ও বিপণনের ওপর নজরদারি
- রপ্তানির নিবন্ধন, ফ্রি সেলস সার্টিফিকেট, জিএমপি (গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্রাকটিস) এবং সিপিপি (সার্টিফিকেট ফর ফার্মাসিউটিক্যাল প্রডাক্ট) সার্টিফিকেট প্রদান

খুচরা ও পাইকারি ওষুধে দোকানের ক্ষেত্রে

- ড্রাগ লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন
- পরীবিক্ষণ ও তদারকি সেবা

৫.১ ওষুধ কোম্পানির গৃহীত সেবা কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন

৫.১.১ ওষুধ কারখানার লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন

একটি ওষুধ কোম্পানির নতুন প্রকল্প স্থাপনে ওষুধ প্রশাসন হতে লাইসেন্স গ্রহন করতে হয়। লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়া দু'টি ধাপে সম্পন্ন হয়ে থাকে। প্রথম ধাপে, প্রকল্পের প্রোফাইল মূল্যায়নের জন্য ২৭টি বিষয় সম্বলিত একটি চেকলিস্ট পূরণ করে আবেদন করতে হয়। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা এ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। পরবর্তীতে আবেদনের চূড়ান্ত মূল্যায়ণের জন্য ম্যানুফেকচারিং প্রজেক্ট ইভালুয়েশন কমিটিতে পাঠানো হয়। এ কমিটি ওষুধ শিল্প সমিতির প্রতিনিধি ও বিএমএ প্রতিনিধিসহ মোট আট সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত। কমিটি প্রকল্পের প্রোফাইল যাচাই বাছাই করে তা অনুমোদনের জন্য মহাপরিচালক বরাবর সুপারিশ করে। দ্বিতীয় ধাপে আবেদনকারীকে প্রোফাইল অনুযায়ী কারখানা স্থাপন করে পূর্ণাঙ্গ লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে হয়। এরপর উক্ত প্রকল্প পরিদর্শণে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের দুই থেকে চার জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে (পরিচালক অথবা সহকারি পরিচালক পদমর্যাদার) একটি পরিদর্শন দল গঠন করা হয়। এ পরিদর্শক দল নিয়ম অনুযায়ী কারখানা স্থাপন করা হয়েছে কিনা অর্থাৎ কারখানার অনুমোদিত প্রোফাইল ও রেসিপির ভিত্তিতে ওষুধ তৈরিতে প্রয়োজনীয় জনবল, যন্ত্রপাতি ও উপকরণ যথাযথ আছে কিনা তা যাচাই করে। পরবর্তীতে পরিদর্শকদের সুপারিশক্রমে প্রকল্পের লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

[২৯] ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ২০১৪

প্রকল্পের লাইসেন্স অনুমোদন ও নবায়ন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি লক্ষণীয়। মূল্যায়ন কর্মকর্তা কর্তৃক কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা আহবানে ইচ্ছাকৃত কালক্ষেপন করা হয়। এক্ষেত্রে মূল্যায়ন কর্মকর্তা আর্থিক সুবিধা গ্রহনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি বা ব্যক্তির প্রকল্প দ্রুত কমিটিতে উপস্থাপন করে। অপরদিকে সাধারণত দু'টি বা তিনটি প্রকল্প একসাথে মূল্যায়ন কমিটিতে উপস্থাপিত করা হয় কিন্তু কোনো কোনো কোম্পানি তাদের প্রকল্পের দ্রুত অনুমোদনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট মুল্যায়ন কর্মকর্তার সাথে যোগসাজসে আর্থিক ও রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে মূল্যায়ন কর্মকর্তা কর্তৃক এককভাবে কমিটির সভা আহবান করে। এছাড়া প্রকল্প অনুমোদনে কমিটির কিছু সদস্যদের মধ্যে সিন্ডিকেট গঠন করা হয়। এক্ষেত্রে কমিটির কিছু সদস্য কর্তৃক নিয়ম বহির্ভূত অর্থ ও উপঢৌকন গ্রহণ করে প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অপরদিকে প্রকল্পের চূড়ান্ত অনুমাদনের পূর্বে প্রকল্প পরিদর্শনে অনিয়ম ও দুর্নীতির যোগসাজস হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কারখানায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অর্ধেক পূরণ না হলেও অনুমোদন প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য অধিদপ্তরের কিছুসংখ্যক কর্মকতা সরকারি চাকুরি বিধি লঙ্ঘন করে কোম্পানিগুলোতে পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ কারনে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির কোন প্রকল্পের লাইসেন্স অনুমোদন করার বিষয় উত্থাপিত হলে তাদের মধ্যে স্বার্থের দন্দ্ব কাজ করে।

লাইসেন্স নবায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ লক্ষণীয়। দুই বছর পর পর প্রকল্পের লাইসেন্স নবায়ন করতে হয়। প্রকল্প লাইসেন্স প্রদানে যে প্রক্রিয়ায় পরিদর্শন করা হয়, নবায়নের ক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় কিন্তু এক্ষেত্রে লাইসেন্স নবায়নে ক্ষেত্রবিশেষে পরিদর্শকরা নির্দেশনা অনুযায়ী পরিদর্শন করে না এবং সমঝোতামূলক দুর্নীতির মাধ্যমে নবায়ন করে থাকে।

বক্স: ওষুধ প্রশাসনের কার্যক্রমে দুর্নীতি

জনাব নাজমুল করিম (ছদ্মনাম) একটি ওষুধ কোম্পানির মালিক। প্রাথমিক পর্যায়ে ওষুধ শিল্পের এ ব্যবসায় তার প্রবেশ মসৃণ ছিলো না। ২০১৩ সালে তিনি খুব উৎসাহ নিয়ে প্রায় ২০০ কোটি টাকার একটি ওষুধ কারখানার প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরী করেন। তার এ প্রকল্পটি আরও তিনটি প্রকল্পের সাথে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটিতে জমা হয়। পরবর্তীতে তিনি জানতে পারেন তারসাথে জমাকৃত অন্য তিনটি প্রকল্প অনুমোদন পেলেও তার প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়নি। অনুমোদনকৃত প্রকল্পগুলোর একটি একজন প্রভাবশালি মন্ত্রীর ভাই হওয়ার কারনে, আরেকটি একজন এমপি'র নিজের প্রকল্প হওয়ায় এবং অপর প্রকল্পটির উদ্যোক্তা কমিটির মেম্বারদের আর্থিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অনুমোদন হয়। এ ঘটনায় তিনি কিছুটা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এ সময়ে অধিদপ্তরের একজন কর্মচারির সাথে তার আলাপ হয়। তিনি তাকে পরামর্শ দেন যে, যেহেতু পূর্ববর্তী প্রকল্পের জন্য তার জমি আছে তাহলে একটি পুরাতন প্রকল্পের লাইসেন্স হস্তান্তরের মাধ্যমে তিনি খুব সহজে কারখানা স্থাপন করতে পারেন কিন্তু এক্ষেত্রে তাকে এক কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে। এ কাজ করতে মধ্যস্থতাকারি হিসেবে সকল প্রকার অপোষের জন্য উক্ত কর্মচারি সাত লাখ টাকা দাবি করে। পরবর্তিতে তিনি জানতে পারেন ঐ ব্যক্তি পুরাতন প্রকল্পের কোম্পানির মালিকের কাছ থেকেও মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পাঁচ লাখ টাকা নেয়। প্রকল্পের হস্তান্তর প্রক্রিয়া শেষ হলে তিনি কারখানা স্থাপনা তৈরিতে উক্ত কর্মচারীর পরামর্শে অধিদপ্তরের একজন উর্ধতন কর্মকর্তাকে এক লক্ষ টাকার পারিশ্রমিকে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দেন। এরপর প্রকল্প পরিদর্শণের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে আপ্যায়ন বাবদ প্রায় ৫০ হাজার টাকা দিতে হয়। ওষুধ ও রেসিপির নিবন্ধনে অফিসে ১০/১২ দিন ঘোরাঘুরি করার পরও যখন কাজ শুরু হয় না তখন তিনি তার প্রকল্প পরিদর্শকের কাছে যান। উক্ত কর্মকর্তা তাকে 'বোকা' সম্বোধন করে এক্ষেত্রে প্রতি পদে পদে টাকা খরচের কথা বলেন। এক্ষেত্রে উক্ত দপ্তরের সহকারিকে ২০ হাজার টাকা দিতে হয় যা ছিল মূলত ফাইল চলমান রাখার প্রাথমিক বিনিয়োগ। এরপর তিনি আর ভুল করেননি পরবর্তীতে রেসিপি অনুমোদন, ওষুধের নিবন্ধন, ব্লক লিস্টের অনুমোদন, ওষুধের ফয়েল, ইনসার্ট এবং মোড়ক ও লিটারেচার অনুমোদনের প্রতিটি ধাপে নিয়ম বহির্ভূত অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন করেন।

৫.১.২ রেসিপি অনুমোদন

একটি ওষুধ তৈরীতে যেসকল উপাদানের প্রয়োজন হয় সেগুলোর অনুমোদনের জন্য ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে রেসিপি আকারে জমা দিতে হয়। রেসিপি অনুমোদনের ক্ষেত্রে নীতি হলো যথার্থ মান, যথার্থ উপাদান এবং কতটুকু বিদ্যমান বিষয়টি অনুসরণ করা। কোম্পানির লাইসেন্স অনুমোদনে কারখানা স্থাপনা পরিদর্শনের পূর্বে রেসিপি জমা দিতে হয়। রেসিপি অনুমোদনে ওষুধ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। রেসিপি জমা দেওয়ার পর ওষুধ প্রশাসনের বিশেষজ্ঞ দল রেসিপিতে উল্লেখিত উপাদান যাচাই বাছাই করে দেখে যে আবেদনকৃত রেসিপিতে মানবদেহের জন্য কোনো ধরনের ক্ষতিকর উপাদান আছে কিনা। রেসিপি অনুমোদনের ক্ষেত্রে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কিছু কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কিছু ওষুধ কোম্পানির অনিয়ম ও দুর্নীতি লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো ওষুধ কোম্পানি রেসিপি অনুমোদনের জন্য প্রথমে এক রকম উপাদান জমা দেয় এবং অনুমোদন পাওয়ার পর বেশি লাভের আশায় উল্লেখিত উপাদানগুলোর মধ্যে কিছু উপাদান পরিবর্তন করে দেয়। মূলত ওষুধ প্রশাসনের সুষ্ঠু ও কার্যকর তদারকির অভাবে কোম্পানিগুলো এ ধরনের কাজ করে থাকে। অপরদিকে রেসিপি কমিটির সভা আহ্বানে অর্থিক লেনদেন না হলে সভা আহ্বানে কালক্ষেপনের বিষয়টি লক্ষণীয়। রেসিপি অনুমোদনের সভা আহ্বানসহ প্রশাসনিক কার্য সম্পাদনে একজন দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকলেও সকলক্ষেত্রে এ নিয়ম অনুসরণ করা হয় না। এক্ষেত্রে প্রভাবশালী কর্মকর্তারা অনিয়মতান্ত্রিকভাবে বিভিন্ন সময়ে নিয়োগ প্রাপ্ত মহাপরিচালককে প্রভাবিত করে নিজেরা এ সকল কার্য সম্পাদন করে এবং আর্থিক সুবিধা গ্রহন করে।

৫.১.৩ ওষুধ নিবন্ধন

রেসিপি অনুমোদনের পরবর্তী একবছরের মধ্যে কোম্পানি কর্তৃক ওষুধের সংযুক্তি জমা দিতে হয়, সংযুক্তিতে ওষুধের ডোজের পরিমান সংশ্লিষ্ট তথ্য বিশেষ করে ওষুধের ফার্মাসিউটিকাল কেমিস্ট্রি সংক্রান্ত তথ্য জমা দিতে হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের তথ্য প্রদান করতে হতে পারে যেমন- ফলিক এসিড সম্পূরক এর জন্য ডিসেলিউশন পরীক্ষার রিপোর্ট, ফ্লুক্সেটাইন ট্যাবলেট এর জন্য বায়োইকুভ্যালেন্স তথ্য এবং যেখানে প্লাসমা কনসেনট্রেশন ও ক্লিনিকাল ইফেক্ট এর ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক থাকে না সেক্ষেত্রে ক্লিনিকাল ট্রায়েল এর প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাংলাদেশে সাধারণত ডিসলিউশন তথ্য প্রদান করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে কোম্পানিগুলো ডিসলিউশন পরীক্ষার তথ্য নিজেরা তৈরি করে দেয়। এছাড়া সংযুক্তির মাধ্যমে ওষুধের নাম পরীক্ষা করা হয় এবং বাজারে অন্যান্য ওষুধের নামের সাথে যেন এটি সম্পূর্ণ মিলে না যায় সেদিকে লক্ষ রেখে তা পরিবীক্ষণ করা হয়। পরবর্তিতে ওষুধ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে উল্লেখিত ওষুধের নিবন্ধন প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য দুই থেকে পাঁচ সদস্যের পরিদর্শক দল গঠন করা হয় যারা সংশ্লিষ্ট কোম্পানি পরিদর্শন করে থাকে। এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হলো উল্লেখিত ওষুধ তৈরীর জন্য উক্ত কোম্পানির প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, স্থাপনা, মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও টেকনিশিয়ান আছে কিনা তা যাচাই করা। ওষুধ নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ওষুধ প্রশাসন এবং কোম্পানির যোগসাজশে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি লক্ষ করা যায়।

অনেকক্ষেত্রে ওষুধ কারখানাগুলোর সংযুক্তিতে নির্দেশিত ওষুধ সঠিকভাবে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকে না তথাপি পরিদর্শক কর্তৃক কোম্পানির সাথে আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে এ বিষয় এড়িয়ে যাওয়া হয় এবং ওষুধের নিবন্ধন দেওয়া হয়। ওষুধ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মতে, ওষুধের নিবন্ধন প্রদানে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি যদি প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করতে না পারে তাহলে সেগুলো পূরণের শর্তসাপেক্ষে পরবর্তীতে লাইসেন্স প্রদান করা হয় কিন্তু এক্ষেত্রে কিছু কিছু ওষুধ কোম্পানি তাদের প্রভাব খাটিয়ে ওষুধের নিবন্ধন পাওয়ার জন্য প্রশাসনে তদবির করে। তখন নিরুপায় হয়ে তাদেরকে নিবন্ধন দিতে হয়। অপরদিকে ওষুধের নাম অনুমোদনেও এ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ইচ্ছাকৃত কালক্ষেপনের অভিযোগ লক্ষণীয়। ওষুধের সংখ্যাভেদে নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে ওষুধের অনুমোদন দেওয়া হয়। আবার, সকল নতুন ওষুধের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে কোম্পানিগুলো অনুমোদনহীন ওষুধ উৎপাদন করে। এক্ষেত্রে ওষুধ প্রশাসনের কোনো কোনো কর্মকর্তার যোগসাজশে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়। অপরদিকে কোনো কোনো কোম্পানি অনুমোদন এর পূর্বে ওষুধ বাজারজাত করে। এক্ষেত্রে ওষুধ প্রশাসন যদি বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞাত হয় তাহলে অনেকক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করা হয় না বরং পেছনের নির্ধারিত সময়ে দুর্নীতির মাধ্যমে উক্ত ওষুধের নিবন্ধন করিয়ে নেওয়া হয়।

৫.১.৪ ওষুধের ফয়েল, ইনসার্ট, লেবেল এবং মোড়ক অনুমোদন

ওষুধ কোম্পানি কর্তৃক ওষুধের সংযুক্তি জমা দেওয়া এবং ওষুধের নিবন্ধনের পরবর্তিতে উৎপাদিত ওষুধের ফয়েল, ইনসার্ট, লেবেল এবং মোড়ক ব্যবহারের জন্য ওষুধ প্রশাসন হতে অনুমোদন নিতে হয়। ওষুধের মোড়ক অনুমোদনের জন্য অধিদপ্তরের নিযুক্ত মেডিকেল অফিসার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ওষুধের মোড়ক অনুমোদনে প্রধান শর্ত হল ওষুধের বিভিন্ন রকম তথ্য যেমন-ওষুধের বাণিজ্যিক নাম, জেনেরিক নাম, উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ন হবার তারিখ, ওষুধের উপাদান, সংরক্ষন প্রক্রিয়া এবং ডোজের পরিমান কেমন হবে তা মোড়কে উল্লেখকরা। কিন্তু এগুলোর অনুমোদনের ক্ষেত্রে ওষুধ প্রশাসনের বিভিন্ন অনিয়ম লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে ওষুধের ফয়েল, লেবেল, ইনসার্ট এবং মোড়ক অনুমোদনে সংশ্লিষ্ট ওষুধের বাণিজ্যিক নাম, জেনেরিক নাম, উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার তারিখ, ওষুধের উপাদান, সংরক্ষণ প্রক্রিয়া ডোজের পরিমাণ সঠিকভাবে যাচাই বাছাই করা হয় না। এ সুযোগে কিছু স্থানীয় ও ছোট কোম্পানি খ্যাতনামা বড় কোম্পানিগুলোর বাণিজ্যিক নাম ও মোড়কের ডিজাইন নকল করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ- যেমনঃ বেক্সিমকো ফার্মার Neoceptin-R এবং এ্যালকো ফার্মার Neocetin-R প্রায় একই নামের ওষুধ যা বাজারে দীর্ঘদিন বিদ্যমান ছিলো। পরবর্তীতে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর আদালত কর্তৃক আদেশপ্রাপ্ত হওয়ার পর ব্যবস্থা গ্রহনে বাধ্য হয়। সাধারণত স্থানীয় ও ছোট কোম্পানিগুলো ওষুধ প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তাদের যোগসাজসে এই ধরনের অনিয়ম করে থাকে। ওষুধ আইন অনুযায়ী ওষুধের বাণিজ্যিক নাম, মোড়কের ডিজাইন কোম্পানিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কথা কিন্তু অনুমোদনের সময় ওষুধ কোম্পানিগুলো ওষুধ প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার যোগসাজশে এই নিয়ম না মেনেই ঘুষের বিনিময়ে অনুমোদন নিয়ে থাকে।

অনেকক্ষেত্রে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃতভাবে ওষুধের ফয়েল, লেবেল এবং মোড়কের অনুমোদন ছাড়পত্রের আবেদনকৃত ফাইল আটকে রাখে এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থ দাবি করে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলো তাদের প্রয়োজনের গুরুত্ব বিবেচনায় দুর্নীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় অথবা সমঝোতামূলক দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। এছাড়া দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকা সত্ত্বেও ওষুধ প্রশাসনের কোন কোন কর্মকর্তা মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদনের দায়িত্বপ্রাপ্ত এমন সিল বানিয়ে অর্থের বিনিময়ে ত্রুটিপূর্ন লেবেল বা ফয়েল অনুমোদন দেয়।

৫.১.৫ ব্লকলিস্টের অনুমোদন

ওষুধ কোম্পানিগুলোকে ওষুধের কাঁচামাল ও প্যাকেজিং সামগ্রী আমদানি করতে হয়। এগুলো আমদানী করার জন্য তাদেরকে সুনির্দিষ্ট ফরম পূরণ করে অনুমোদনের জন্য ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরে জমা দিতে হয়। এই ফরমকে ব্লকলিস্ট বলা হয়। ব্লকলিস্টে কিছু তথ্য যেমন- আমদানির উদ্দেশ্য, আমদানীকৃত কাঁচামাল/প্যাকেজিং সামগ্রির নাম, উৎপাদকের নাম, চাহিদার পরিমাণ, দাম, উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ ইত্যাদি উল্লেখ করতে হয় । ব্লকলিস্ট অনুমোদনে এগার সদস্যের 'স্টান্ডিং কমিটি ফর ইমপোর্ট অব ফার্মাসিউটিক্যালস' কাঁচামাল আমদানীর প্রয়োজনীয়তা নিরীক্ষা এবং কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রীর অনুমোদন দিয়ে থাকে। ব্লক লিস্টের অনুমোদনে সংশ্লিষ্ট ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কিছু কর্মকর্তার অনিয়ম ও দুর্নীতি লক্ষণীয়। এ কাজে নিযুক্ত কিছু কর্মকর্তা অনেক সময়ই ব্লক লিস্টে উল্লেখিত মালামাল সঠিকভাবে আমদানি করছে কিনা এবং বছর শেষে আমদানিকৃত মালের হিসাব প্রদান করছে কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলো ঠিকমতো যাচাই বাছাই না করেই সমঝোতা মূলক দুর্নীতির মাধ্যমে প্রাথমিক অনুমোদন দিয়ে থাকে। অপরদিকে ব্লক লিস্ট অনুমোদনে অনেকসময় কমিটির সদস্যদের সাথে কোম্পানিগুলো এ কমিটির সভার বাহিরে অর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে একধরনের স্বার্থের সম্পর্ক গড়ে তোলে যা পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির ব্লক লিস্টের অনুমোদন প্রাপ্তিতে সাহায্য করে। এ সুযোগে আমদানিকারকরা অনেকসময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাঁচামাল আমদানি করে থাকে। এ ক্ষেত্রে কিছু আমদানিকারক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত কাঁচামাল বাইরে খোলা বাজারে বিক্রি করে থাকে। আবার অনেক কোম্পানি আমদানিকৃত কাঁচামাল তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ন ব্যবহার করতে পারে না এবং এ সকল উদ্বৃত কাঁচামালও পরবর্তিতে তারা খোলা বাজারে বিক্রি করে থাকে। ব্লক লিস্টের মাধ্যমে আমদানিকৃত কাঁচামাল শুধুমাত্র আমদানিকারক কর্তৃক প্রদত্ত বিল অফ এন্ট্রির তথ্যের ভিত্তিতে ওষুধ প্রশাসন তাদের তদারকি কার্যক্রম সম্পন্ন করে এবং ছাড়পত্র প্রদান করে। কিন্তু আমদানিকৃত কাঁচামালের গুণগত মানের তদারকি ও পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর কোন প্রকার ভূমিকা পালন করে না।

৫.১.৬ ওষুধের লিটারেচার অনুমোদন

ওষুধ কোম্পানিগুলোর উৎপাদিত ওষুধের বিভিন্ন ধরণের তথ্য যেমন: ওষুধের উপাদান, ডোজের পরিমান, সংরক্ষণ ব্যবস্থা, পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়সমূহ পুস্তিকা বা লিফলেট আকারে ছেপে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে জমা দিয়ে অনুমোদন নিতে হয় যা লিটারেচার নামে পরিচিত। ওষুধের লিটারেচার অনুমোদনে এ সকল তথ্যসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লিটারেচার অনুমোদনের ক্ষেত্রেও অনিয়ম ও দুর্নীতি লক্ষ করা যায় যেমন- কিছু কোম্পানি কর্তৃক লিটারেচারে মিথ্যা তথ্য প্রদর্শণ করা হয় এবং এক্ষেত্রে কোম্পানিগুলো লিটারেচারে পূর্ণাঙ্গ তথ্য না দিয়ে মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকরদিকগুলো গোপন করে থাকে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় লিটারেচার অনুমোদনে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব এবং প্রয়োজনীয় তথ্য যাচাই বাছাইয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও মেধার ঘাটতি রয়েছে। বর্তমানে মাত্র একজন কর্মকর্তা লিটারেচার অনুমোদন দিয়ে থাকে। এর ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। ওষুধ কোম্পানিগুলো এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে লিটারেচারে পূর্ণাঙ্গ তথ্য না দিয়ে ওষুধ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়ে লিটারেচারের অনুমোদন সংগ্রহ করে থাকে। অপরদিকে এ সুযোগে কোন কোন কোম্পানি ওষুধ প্রশাসন থেকে লিটারেচারের অনুমোদন না নিয়েই ওষুধ বাজারজাত করছে। ওষুধ প্রশাসন অনেক ক্ষেত্রে তা জানলেও অবৈধ অর্থের লেনদেনের কারণে তা এড়িয়ে যায়। অপরদিকে, কোন কোন ক্ষেত্রে ওষুধের লিটারেচারে অতিরিক্ত বিভিন্ন উপাদান বা উপকারিতার কথা বলা হয় যা উক্ত ওষুধের সাথে প্রযোজ্য নয় তথাপি ওষুধ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের যোগসাজসে এ ধরনে লিটারেচারের অনুমোদন নেওয়া হয়।

৫.১.৭ ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণ ও নমুনা পরীক্ষা

ওষুধ কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদিত ওষুধ বাজারজাত করার পূর্বে ওষুধ প্রশাসন হতে ওষুধের গুনগত মানের ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে ওষুধের মান পরীক্ষা সাধারণত বাজারজাত করার পূর্বে এবং বাজারজাত করার পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে হয়ে থাকে। ওষুধ বাজারজাত করার পূর্বে কোম্পানি কর্তৃক ছাড়পত্র গ্রহনের জন্য ওষুধের বিভিন্ন উপাত্ত যেমন- ডিসলিউশন টেস্ট, বায়ুইকুভ্যালেন্স টেস্ট ইত্যাদি উপাত্ত ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট জমা দিতে হয়। পরবর্তীতে কোম্পানিগুলোর ওষুধ বাজারজাত করনের পরে ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট ওষুধ তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক বাজার হতে বিভিন্ন ওষুধ দৈবচয়িতভাবে সংগ্রহ করে নমুনা পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটেরিতে প্রেরনের নিয়ম রয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ওষুধের নমুনা পরীক্ষা ও মান নিয়ন্ত্রণ সেবায় বিভিন্ন ধরণের অনিয়ম ও দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয়। ওষুধ কোম্পানিগুলোর বাজারজাতকৃত ওষুধ থেকে ব্যাচ অনুযায়ী দৈবচয়ন নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ করে ওষুধ পরীক্ষাগারে পাঠানোর নিয়ম থাকলেও অনেকক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয় না। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পরীক্ষাগার সংশ্লিষ্ট কিছু কর্মকর্তা ওষুধের মান পরীক্ষা না করে সমঝোতামূলক দুর্নীতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ওষুধের ছাড়পত্র প্রদান করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে কিছু ছোট ও স্থানীয় ওষুধ কোম্পানির নিজস্ব পরীক্ষাগারে সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষার

সুবিধা না থাকায় তাদের উৎপাদিত ওষুধের মান পরীক্ষা অধিদপ্তরের পরীক্ষাগারে সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু পরীক্ষাগারে প্রয়োজনীয় জনবল, যন্ত্রপাতির অভাব থাকায় এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী অনিয়মের সুযোগ গ্রহন করে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোর সাথে যোগ সাজসে ওষুধের মান পরীক্ষায় মিথ্যা তথ্য প্রদান করে ছাড়পত্র দিয়ে থাকে।

ওষুধ উৎপাদনের পর তার গুণগত মান ঠিক রাখার জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ওষুধের কার্যকরতা ও বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে কোন ক্যাটাগরীর ওষুধ কিভাবে সংরক্ষণ করা হবে সে সম্পর্কে ওষুধ প্রশাসন হতে একটি নির্দেশনা প্রদান করার নিয়ম রয়েছে। এছাড়াও ওষুধ কোম্পানিগুলো উল্লেখিত নিয়ম পালন করছে কি না তাও ওষুধ প্রশাসন হতে নিয়মিতভাবে তদারকি করার নিয়ম রয়েছে। গবেষণায় পর্যবেক্ষণে দেখা যায় বেশিরভাগ কোম্পানিরই বিশেষ করে ছোট কোম্পানিগুলোর উৎপাদিত ওষুধ ও এর কাঁচামাল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেই। ছোট কোম্পানিগুলোর এ ধরনের অনিয়ম ওষুধ প্রশাসন হতে নিয়মিতভাবে তদারকি করা হয় না। তাছাড়া ওষুধ কোম্পানিগুলো তাদের এ ধরনের অব্যবস্থাপনা ও অনিয়ম ঢাকার জন্য সংশ্লিষ্ট ওষুধ তত্ত্বাবধায়ককে বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করে থাকে। ওষুধের কাঁচামাল তৈরীর সময় বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় বিষাক্ত পদার্থ ব্যাবহার করা হয়; যেমনঃ অ্যাসিটোন, বিভিন্ন ওষুধের কাঁচামাল প্রস্তুতে এটি ব্যবহৃত হয় যা ক্যান্সার জাতীয় রোগ সৃষ্টিতে অত্যন্ত কার্যকর। এ কারনে সাধারনত ৮টি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পদার্থটিকে বিচ্ছিন্ন করার নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, এ ধরনের বিষাক্ত পদার্থ বিচ্ছিন্ন করার পদ্ধতি অনেক ব্যায়বহুল হওয়ায় অনেক উৎপাদনকারী এর সম্পূর্ন প্রক্রিয়া অনুসরন করে না যার কারণে এ ধরনের পদার্থ ওষুধে বিদ্যমান থাকে। এছাড়া আইনানুযায়ী ওষুধে ব্যবহৃত উপাদান অবশ্যই ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া, অথবা ব্রিটিশ ফার্মাসিউটিকাল কোডেক্স অথবা ইউনাইটেড স্টেটস ফার্মাকোপিয়ার যে কোন প্রবন্ধে উল্লেখ থাকতে হবে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ওষুধের উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয় না অথচ ওষুধের ফয়েলে ওষুধের মান চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বিপি, ইউএসপি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এ সকল বিষয়ে ছাড়পত্র প্রদানে পূর্বে সঠিক ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে না যা এ অনিয়মকে সাধারণ বাস্তবতায় পরিণত করেছে।

৫.১.৮ ওষুধের মূল্য নির্ধারণ

ওষুধের মূল্য নির্ধারনে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ক্ষমতা মূলত কাগজে কলমে বিদ্যমান। ওষুধ কোম্পানিগুলোই মূলত তাদের উৎপাদিত ওষুধের মূল্য নির্ধারণ করে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর শুধুমাত্র ১১৭টি অত্যাবশকীয় ওষুধের মূল্য নির্ধারণ করতে পারে যদিও এর মধ্যে অনেক ওষুধই বর্তমানে উৎপাদিত হয় না। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০১ সালের পূর্বে ওষুধের মূল্য নির্ধারনে ওষুধ প্রশাসনের সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলো কিন্তু পরবর্তীতে এক্ষেত্রে ওষুধ প্রশাসন নামমাত্র ভূমিকা পালন করে এবং কোম্পানিগুলো নিজস্ব তত্ত্বাবধায়নে ওষুধের মূল্য নির্ধারন করে ওষুধের মূল্য নির্ধারণ কমিটির মাধ্যমে তা অনুমোদন করিয়ে নেয়। কোম্পানিগুলো তাদের উৎপাদিত ওষুধের মূল্য নির্ধারণ করে ওষুধ প্রশাসনে নিবন্ধনের জন্য জমা দেয় এবং ওষুধ প্রশাসনের এ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা শুধুমাত্র নিয়মানুযায়ী ভ্যাট সংযোগ করে মূল্য নির্ধারণ কমিটিতে তা পর্যালোচনার জন্য জমা দেয়। মূল্য নির্ধারণ কমিটি বিভিন্ন কোম্পানীর উৎপাদিত নতুন ওষুধের মূল্য নির্ধারনসহ চলতি ওষুধের পুনঃমূল্য নির্ধারন করে থাকে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীকে নিয়মানুযায়ী মুল্য নির্ধারণ ও পূনঃনির্ধারণের জন্য ওষুধ প্রশাসন বরাবর আবেদন করতে হয়। মূল্য নির্ধারণ কমিটি সংশ্লিষ্ট ওষুধের সাথে অন্যান্য কোম্পানীর ওষুধের মূল্যের তুলনা, ওষুধের কাঁচামালের বিবরণ, উৎপাদন খরচসহ আবেদনপত্রে উল্লেখিত বিষয়াদি যাচাই বাছাই করে থাকে।

> **বক্সঃ মূল্য অনুমোদনের আগেই বাজারে ওষুধ**
>
> কিছু কিছু কোম্পানী তাদের উৎপাদিত ওষুধ ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর হতে দাম অনুমোদিত হওয়ার আগেই বাজারে বিক্রি করে। এ ধরণের একটি ঘটনা ঘটেছে 'ক' নামক ওষুধ কোম্পানির উৎপাদিত ওষুধ মেড্রোক্সি- ৫ মি. গ্রাম এর ক্ষেত্রে। এই ওষুধটি হরমোনজনিত চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয়। ওষুধটির মূল্য অনুমোদনের জন্য কোম্পানিটি ওষুধ প্রশাসন বরাবর আবেদনও করেছিল। কিন্তু প্রস্তাবিত মূল্য অনুমোদনের আগেই ঐ কোম্পানি ওষুধটি বাজারে বিপনন শুরু করে করে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় ওষুধটির ৩০টি ট্যাবলেটের একটি প্যাকেট ১৪১.৩৮ টাকায় বিভিন্ন ফার্মেসীতে বিক্রি হচ্ছে এবং প্যাকেটের গায়ে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য লেখা ছিল ১৬০.৮০ টাকা। ঐ কোম্পানির ইনভয়েস থেকে দেখা যায় যে মার্চের ১০ তারিখে শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেটে ওষুধটি বিক্রি হয়েছিল। এছাড়াও ওষুধটি শহরের অন্যান্য স্থানের ফার্মেসীতেও পাওয়া যাচ্ছে এবং ডাক্তাররাও ওষুধটি তাদের রোগীদের ব্যবস্থাপত্রে লিখছে।

ওষুধের মুল্য নির্ধারণে মূল্য নির্ধারণ কমিটিতে ওষুধ কোম্পানির মালিকদের শক্তিশালী ভূমিকা এবং প্রভাব বিস্তার লক্ষণীয়। অনেক ক্ষেত্রে কমিটির সদস্য নিজেই নিজের কোম্পানির ওষুধের মূল্য নির্ধারণে মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। গবেষণায় পর্যবেক্ষণে দেখা যায় বাজারে কিছু কোম্পানি তাদের উৎপাদিত ওষুধের মূল্য নির্ধারনের আগেই বিপনন করে থাকে। আবার কিছু কোম্পানি তাদের ওষুধের মূল্য পূন:নির্ধারণ বা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে ওষুধ প্রশাসন হতে কোনো ধরনের অনুমতি পত্র সংগ্রহ করে না। এক্ষেত্রে ওষুধ প্রশাসন হতে কোম্পানিগুলোর ওপর তদারকি বা পরীবিক্ষণও করা হয় না। অপরদিকে, ওষুধ

(নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এ সরকার কর্তৃক গেজেট জারির মাধ্যমে[৩০] আমদানিকৃত কাঁচামালসহ সকল প্রকার ওষুধের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করার বিধান থাকলেও তা নিয়মিত প্রকাশ করা হয় না, যার ফলে অতিরিক্ত মূল্যে পণ্য বিক্রির জন্য যে শাস্তির[৩১] বিধান রয়েছে তা কখনও কার্যকর হয় না।

এছাড়া, ওষুধের মূল্য নির্ধারণে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের দুর্বল ভূমিকার কারনে অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন কোম্পানি জোটবদ্ধ হয়ে মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রন করে যা কোম্পানিগুলোর অতিমুনাফার সুযোগ তৈরী করে এবং এভাবে তাদের উৎপাদিত কিছু ওষুধের দাম বিভিন্ন সময়ে বাজারে অতিরিক্ত হয়ে থাকে। মূল্য নির্ধারনে অধিদপ্তরের ভূমিকা না থাকলেও এ ক্ষেত্রে কোম্পানিগুলোর আবেদনপত্র ও নিবন্ধন লাভে একপ্রকার নিয়মতান্ত্রিক দুর্নীতি বা অতিরিক্ত অর্থ লেনদেন হয়ে থাকে।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মূল্য নির্ধারণ কমিটি বিদেশ থেকে আমদানীকৃত ওষুধের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। এক্ষেত্রে আমদানীকারককে সংশ্লিষ্ট ওষুধের বিভিন্ন প্যারামিটার যেমন: ওষুধের ক্রয় মূল্য, আমদানী খরচ ইত্যাদি বিষয় উল্লেখকরে আবেদন করতে হয়। বিদেশ থেকে আমদানীকৃত ওষুধের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ওষুধ প্রশাসন ও আমদানীকারকদের মধ্যে অনিয়ম ও দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয়। গবেষণায় তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, আমদানিকারকদের মধ্যে কেউ কেউ ওষুধ প্রশাসনের মূল্য নির্ধারণ কমিটির সদস্য হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এর ফলে ওষুধের দাম নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে তাদের প্রচ্ছন্ন ভূমিকা থাকে এবং কমিটির অন্যান্য সদস্যদেরকে আমদানিকারক দ্বারা প্রভাবিত হতে হয়। এছাড়া আমদানিকারকরা ওষুধ প্রশাসনে আমদানীকৃত ওষুধের ক্রয়মূল্য দাখিল করার সময় সংশ্লিষ্ট বিদেশী কোম্পানির সাথে যোগসাজসে প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি দেখিয়ে থাকে। ওষুধ প্রশাসন হতে ঠিকমতো তদারকি এবং তদারকির ক্ষেত্রে অদক্ষতার কারনে বেশি মূল্য দেখিয়েই অনেক সময় মূল্য অনুমোদন হয়ে যায়।

৫.১.৯ গুড ম্যানুফেকচারিং প্রাকটিস (জিএমপি) সনদ

গুড ম্যানুফেকচারিং প্রাকটিস (জিএমপি) হচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত গাইডলাইন যার মূল কথা হল 'Write everything that you have done.' জিএমপি'র প্রধান শর্ত হচ্ছে ওষুধ কোম্পানিগুলো ওষুধ উৎপাদনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা যা করবে তার সব কিছুই লিখিত আকারে সংরক্ষন করবে। সাধারণত ৪ ধরনের আন্তর্জাতিক জিএমপি গাইড লাইন বিদ্যমান: দি ইন্টারন্যাশনাল ফার্মাসিউটিকাল কোঅপারেশন স্কিম (আইপিসিএস), আমেরিকা এফডিএ কর্তৃক প্রনীত জিএমপি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক প্রনীত জিএমপি এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রনীত জিএমপি[৩২]। জিএমপির বিভিন্ন গাইডলাইন এর কারনে জিএমপি অনুসরণে সুনির্দিষ্ট কোনো গাইডলাইন মানা হয় না এবং এটা সর্বদাই পরিবর্তনশীল। জিএমপি অনুসরণ করলে এর মধ্যে ওষুধ কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরর সুযোগ সুবিধার বিষয় চলে আসে। আমাদের দেশের ওষুধ কোম্পানিগুলোর জিএমপি অনসরণ করার বিষয়টিও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে দাড়িয়েছে। প্রকৃত অর্থে দেশের বেশিরভাগ (বিশেষত ছোট ওষুধ কোম্পানি) কোম্পানিই এই জিএমপি অনুসরণ করে না। ওষুধ কোম্পানিগুলো সঠিকভাবে জিএমপি'র বিষয়গুলো অনুসরণ করছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের। সাধারণত ওষুধ প্রশাসন হতে কোম্পানিগুলোকে এই বিষয়ে একটি গাইডলাইন দেওয়ার কথা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রশাসন এই গাইডলাইন সরবরাহ করে না আবার অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় ওষুধ প্রশাসন সরবরাহ করলেও কোম্পানিগুলো বেশি মুনাফা লাভের আশায় তা অনুসরন করে না। গবেষণায় তথ্যানুযায়ী, ওষুধ প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা কোম্পানি পরিদর্শণ

> **বক্স: জিএমপি অনুসরন বৃদ্ধিতে মালয়শিয়ার ওষুধ প্রশাসন কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপ**
>
> জিএমপি অনুসরণে মালয়শিয়া এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে অগ্রগামি হিসেবে চিহ্নিত হয়। এ ক্ষেত্রে মালয়শিয়ার ওষুধ প্রশাসন কর্তৃক গৃহীত কিছু পদক্ষেপ অত্যন্ত কার্যকর হিসেবে পরিগনিত হয়[১]।
>
> - গ্রাহক বান্ধব সেবা চালু এবং ওয়ানস্টপ তথ্য কেন্দ্র স্থাপন
> - প্রযুক্তি নির্দেশিকা সরবরাহ
> - ডায়ালগ সেশন ও এ শিল্পের কর্মকর্তাদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষন
> - জিএমপি নিশ্চিতে শিল্পের প্রতিনিধিসহ প্রযুক্তিতে দক্ষ কর্মী দল গঠন
> - জিএমপি উন্নয়নে, উৎপাদনকারীদের অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুপারিশকরণ
> - বৈদেশিক অংশিদারিত্ব উৎসাহিত করা এর ফলে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও কার্যকর জোট গঠন করা

[৩০] Drug (Control) Ordinance, 1982; Section 11.(1) The Government may, by notification in the official Gazzette, fix the maximum price at which any medicine may be sold. (2) The Government may by notification in the official Gazette, fix the maximum price at which any pharmaceutical raw material may be imported or sold.

[৩১] Drug (Control) Ordinance, 1982; Section 19. Whoever sells any medicine, imports, or sells any pharmaceutical raw material at a price higher than the maximum price fixed by the Government under section 11 shall be punishable with rigorous imprisonment for a term, which may extend to two years, or with fine, which may extend to ten thousand Taka, or with both.

[৩২] প্রাগুক্ত ২

না করে অথবা পরিদর্শণকালীন নানা ধরনের অনিয়ম পাওয়া সত্ত্বেও জিএমপি সনদ প্রদান করে। বিশ্বব্যাংক এর একটি গবেষণায় বাংলাদেশে জিএমপি সার্টিফিকেট প্রদানে ওষুধ প্রশাসনের দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের অদক্ষ এবং রাজনৈতিক চাপে তারা বেশির ভাগ জিএমপি সার্টিফিকেট অনুমোদন দিয়ে থাকে বলে উল্লেখ করা হয়। উপরন্তু ২০০৭ সালে ৩০ টি কোম্পানি ওষুধ প্রশাসন হতে রপ্তানির অনুমোদন এবং জিএমপি সার্টিফিকেট লাভ করে। পরবর্তীতে ইউনিসেফ এর একটি পরীক্ষায় এ কোম্পানিগুলোর মধ্যে ৪টি কোম্পানিকে সম্পূর্ন জিএমপি অনুসরণকারী এবং ২ টি কোম্পানিকে আংশিক জিএমপি অনুসরণকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়[৩৩]।

৫.১.১০ নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনও সি) সেবা

সাধারণত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বা গবেষণা কাজে বিদেশি ওষুধ ও ওষুধ দ্রব্যাদি স্বল্প পরিমানে আমদানির ক্ষেত্রে এনওসি'র নিয়ম অনুসরণ করা হয়। ওষুধ আইন, ১৯৪০ ধারা ১০ অনুযায়ী[৩৪] এসকল ওষুধ আমদানির ক্ষেত্রে বিধিবিধান শিথিলযোগ্য। উপরন্তু এ ধরনের ওষুধ ও দ্রব্যাদি আমদানিতে শুল্ক প্রদান করতে হয় না। ওষুধ প্রশাসন কর্তৃক প্রদত্ত এনওসি সেবায় অনিয়ম সংগঠিত হওয়ার অভিযোগ লক্ষণীয়। এনওসি'র নিয়ম লঙ্ঘন করে করে বিভিন্ন সময়ে ওষুধ প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তার যোগসাজসে কিছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের অতিরিক্ত আমদানি করার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া ওষুধ প্রশাসনের কিছু প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের মাধ্যমে এনওসি অনুমোদনের এখতিয়ার দীর্ঘদিন নিজেদের অধিকারে রাখা এবং ক্ষেত্রবিশেষে কিছু কর্মকর্তা কর্তৃক এ ধরনের ওষুধ ও দ্রব্যাদি আমদানিতে নিজেই বিনিয়োগ করার অভিযোগ লক্ষণীয়।

৫.২ খুচরা ও পাইকারী ওষুধ দোকানের প্রদত্ত সেবা কার্যক্রম অনিয়মের ধরন

৫.২.১ ড্রাগ লাইসেন্স

১৯৪০ সালের ওষুধ আইনের ১৮ (সি) ধারা অনুযায়ী ওষুধ তৈরী বা বিক্রয় করা, স্টক করা বা বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন করতে হলে ওষুধ প্রশাসন হতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ড্রাগ লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়। ওষুধ প্রশাসনের ২০১৩ সালের হিসাব মতে দেশে বর্তমানে ১ লক্ষ ১২ হাজার ২ শত ১৮টি খুচরা ও পাইকারি রেজিস্টার্ড ওষুধের দোকান রয়েছে[৩৫]। বেসরকারী হিসাব মতে সারাদেশে প্রায় ৩ লক্ষেরও বেশি ড্রাগ লাইসেন্সবিহীন ওষুধের দোকান আছে[৩৬]। ড্রাগ লাইসেন্স পেতে হলে কিছু শর্তাবলীর অধীনে আবেদন করতে হয় এবং এর জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমান ফি প্রদান করতে হয়। ড্রাগ লাইসেন্সের আবেদনপত্রের সাথে নিয়োজিত ফার্মাসিস্ট এর সনদ, ট্রেড লাইসেন্স, অঙ্গীকারনামা ইত্যাদি সনদপত্র সংযুক্ত করতে হয়। প্রতি দুই বছর পরপর ড্রাগ লাইসেন্স নবায়ন করতে হয়। ড্রাগ লাইসেন্স সরবরাহ সেবায় বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরণ নিম্নে আলোচনা করা হল-

৫.২.২.১ একজন ফার্মাসিস্টের বিপরীতে একের অধিক ড্রাগ লাইসেন্স ইস্যুকরণ

ওষুধের দোকানের লাইসেন্স ইস্যু করা এবং লাইসেন্সবিহীন দোকানসমূহকে আইনের আওতায় আনা ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ড্রাগ লাইসেন্স ইস্যু করার ক্ষেত্রে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় বর্তমানে দেশে বর্তমানে ১ লক্ষ ১২ হাজার ২ শত ১৮টি খুচরা ও পাইকারি রেজিস্টার্ড ওষুধের দোকান রয়েছে। ড্রাগ লাইসেন্স আবেদনে নিয়ম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর অথবা ড্রাগ স্টোরের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তির অবশ্যই 'সি গ্রেড' এর ফার্মেসী কোর্স এর সার্টিফিকেট থাকতে হবে। এই হিসেবে সারাদেশে 'সি গ্রেডের' ফার্মাসিস্টের সংখ্যাও দোকানের সংখ্যা সমপরিমান হওয়া উচিত। কিন্তু বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী সারাদেশে রেজিষ্ট্রেশনধারী 'সি' গ্রেডের ফার্মাসিস্ট এর সংখ্যা হচ্ছে ৬৯ হাজার ৬ শত ৪৮ জন (১৮ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখের তথ্য)। বিগত ২০০১-২০০৪ সালে ওষুধ প্রশাসন হতে সারা দেশে প্রায় ২৫-৩০ হাজার নতুন ড্রাগ লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। উল্লেখিত বছরগুলোতে মূলত: একই ফার্মাসিস্ট এর রেজিস্ট্রেশন ২/৩ বার দেখিয়ে এবং এক জেলার ফার্মাসিস্ট এর রেজিষ্ট্রেশন নম্বর দিয়ে অন্যান্য জেলায় লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে।

৫.২.২.২ ড্রাগ লাইসেন্স গ্রহণ ও নবায়নে নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত প্রদান

[৩৩] প্রাগুক্ত;৮

[৩৪] Drug Act, 1940; section 10(f): Any drug the import of which is prohibited by rule made under this Chapter: Provided that nothing in this section shall apply to the import, subject to prescribed conditions, of small quantities of any drug for the purpose of examination, test or analysis or for personal use.

[৩৫] ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঢাকা ২০১৪

[৩৬] মূখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনা হতে প্রাপ্ত তথ্য, বাংলাদেশ কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট সমিতি

নতুন খুচরা ও পাইকারি ড্রাগ লাইসেন্স প্রদান ও বাতিলের জন্য দেশের প্রতিটি জেলায় ছয়জন সদস্যের সমন্বয়ে একটি জেলা ড্রাগ লাইসেন্সিং কমিটি আছে। এই কমিটির সভাপতি হচ্ছেন সিভিল সার্জন এবং সদস্য সচিব হচ্ছেন সংশ্লিষ্ট জেলার ওষুধ তত্ত্বাবধায়ক। এছাড়াও অন্যান্য সদস্যরা হচ্ছেন জেলা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক, সদর উপজেলার টিএইচও এবং সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার। এই কমিটির কার্যকরতার ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে স্থানীয় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ও কমিটির সদস্যদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, কমিটির সভা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত না হওয়া উল্লেখযোগ্য। এই কমিটির কার্যকরতার ঘাটতির কারনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে ড্রাগ লাইসেন্স প্রদানে জেলা কমিটি কর্তৃক সঠিকভাবে মূল্যায়িত হয় না এবং মাঠ পর্যায়ে ড্রাগ লাইসেন্স প্রদানে অনিয়ম ও দুর্নীতির সূযোগ সৃষ্টি হয়। নতুন ড্রাগ লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা হলে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার ওষুধ তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব হল ঐ দোকান পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ জেলা ড্রাগ লাইসেন্স কমিটিতে উপস্থাপন করা। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় সংশ্লিষ্ট ওষুধ তত্ত্বাবধায়কের এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করে উভয়পক্ষের যোগসাজসে প্রাথমিক অনুমোদন দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নতুন লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নে নির্ধারিত ফি ছাড়াও নিয়ম বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়।

৫.২.২.৩ ওষুধের দোকান পরীবিক্ষণ ও তদারকি

১৯৪০ সালের ওষুধ আইনের ২২ নং ধারা অনুযায়ী ওষুধের দোকান পরীবিক্ষণ ও তদারকির ক্ষেত্রে ওষুধ তত্ত্বাবধায়কদের আইনি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষমতা বলে ওষুধ তত্ত্বাবধায়করা মাঠ পরিদর্শণকালে খুচরা ও পাইকারি ওষুধের দোকান হতে নমুনা সংগ্রহ, অবৈধ ও ভেজাল ওষুধ বাজেয়াপ্ত করা, লাইসেন্সবিহীন দোকানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণসহ খুচরা ও পাইকারী ওষুধ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উক্ত দোকানের ড্রাগ লাইসেন্স, ওষুধ রাখার স্থান, সংরক্ষণের স্থান, ওষুধের রেজিস্ট্রার পরিদর্শনের মাধ্যমে অনিবন্ধিত ঔষধ সনাক্তকরনসহ দোকানে সঠিক তাপমাত্রায় ওষুধ সংরক্ষণ করা করা হয় কিনা ইত্যাদি বিষয় দেখে থাকে। ওষুধের দোকান পরিদর্শনের ক্ষেত্রে ওষুধ তত্ত্বাবধায়কদের অনিয়ম ও দুর্নীতি লক্ষ্য করা যায়। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ওষুধের দোকান পরীবিক্ষণ ও তদারকির ক্ষেত্রে ওষুধ তত্ত্বাবধায়ক ও ওষুধের দোকানদারদের মধ্যে দুর্নীতির যোগসাজশ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ওষুধের দোকান পরিবীক্ষণ ও তদারকিতে যথাযথ নিয়ম অনুসরণ না করে দোকানীদের কাছ থেকে অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে তাদেরকে উল্লেখিত নিয়মাবলী ও শর্তসমূহ শিথিল করে করে থাকে। মূলত এ অনিয়মের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতামূলক দুর্নীতি কাজ করে থাকে।

৫.৩ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের তদারকির ঘাটতি ও ওষুধ কোম্পানি কর্তৃক অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সুষ্ঠু তদারকির ঘাটতির কারণে কিছু ওষুধ কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ লক্ষণীয়। কিছু ওষুধ কোম্পানি দেশে ও বিদেশে ওষুধ বিপণনে তাদের উৎপাদিত ওষুধে ব্যবহৃত কাঁচামালের দাম ও গুণগত মানের ভিন্নতার অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে বিদেশে রপ্তানিতে তারা উন্নতমানের কাঁচামালের ব্যবহার ও স্থানীয় বাজারে বিপণনের জন্য নিম্নমানের মানের কাঁচামাল ব্যবহার করে থাকে। আবার কিছু কোম্পানি কর্তৃক ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ বিচ্ছিন্ন করার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া কিছু কোম্পানি কর্তৃক ওষুধ তৈরিতে বিভিন্ন ফার্মাকোপিয়া অনুসরণ না করা সত্ত্বেও ওষুধের ফয়েলে বিপি, ইউএসপি উল্লেখ করার অভিযোগ পাওয়া যায়। ওষুধ প্রশাসন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটিতে বিশেষত: ব্লক লিস্ট অনুমোদন কমিটি এবং মূল্য নির্ধারণ কমিটিতে কিছু প্রভাবশালী কোম্পানির সদস্য কর্তৃক নিজ কোম্পানিসহ অন্য কোম্পানির ওষুধের ব্লক লিস্ট অনুমোদনে প্রভাব বিস্তার এবং মূল্য নির্ধারনে কিছু ওষুধ কোম্পানির মালিকদের শক্তিশালী ভূমিকা এবং অনৈতিক প্রভাব লক্ষণীয়। এর ফলে দেখা যায় কিছু কোম্পানি কর্তৃক জোটবদ্ধ হয়ে কিছু ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রন করে থাকে। আইন অনুযায়ী ওষুধের মোড়কে উৎপাদন কারখানার নাম ও অবস্থান উল্লেখ করার বিধান থাকলেও কিছু দেশি ও বিদেশি কোম্পানি কর্তৃক ক্ষেত্রবিশেষে তা উল্লেখ না করার অভিযোগ পাওয়া যায়। আবার কিছু ওষুধ কোম্পানি কর্তৃক ওষুধের রেজিস্ট্রেশন ও মূল্য অনুমোদনের পূর্বেই বাজারজাত করার অভিযোগ রয়েছে।

৫.৪ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যক্রমে নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ

সারণি ৫.১: ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যক্রমে নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ

সেবার ধরন	নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদায়ের পরিমাণ
নতুন লাইসেন্স প্রদান (অ্যালোপ্যাথিক)	৫ - ১০ লক্ষ
লাইসেন্স নবায়ন	৫০ হাজার- ১ লক্ষ
প্রকল্প হস্তান্তর/স্থানান্তর	১০ - ১৫ লক্ষ
রেসিপি অনুমোদন	৪ - ৫ হাজার (রেসিপি প্রতি)
ওষুধ নিবন্ধন	১ - ১.৫ লক্ষ
ফয়েল, ইনসার্ট, লেবেল অনুমোদন	৭ - ৯ হাজার (খসড়া ও চূড়ান্ত)
ব্লকলিস্ট অনুমোদন	২ - ২.৫ হাজার (পেজ প্রতি)
লিটারেচার অনুমোদন	৪- ৫ হাজার (প্রডাক্ট প্রতি)
মূল্য নির্ধারণ	৫ - ৬ হাজার (প্রডাক্ট প্রতি)
ওষুধ রপ্তানির নিবন্ধন ও জিএমপি সনদ	২০ - ৩০ হাজার (উভয়ক্ষেত্রে)
নমুনা পরীক্ষা ও মান নিয়ন্ত্রণ	৬ - ৭ হাজার (নমুনা প্রতি)
ড্রাগ লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	১০ - ১৫ হাজার
ড্রাগ লাইসেন্স নবায়ন	৫ শত - ১ হাজার (নবায়ন)

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, ওষুধ প্রশাসনের সেবার প্রতিটি পর্যায়েই সমঝোতামূলক দুর্নীতি বিদ্যমান। ওষুধ প্রশাসন কর্তৃক ওষুধ শিল্প তদারকি ও পরীবিক্ষণে দুর্বলতা ও ঘাটতি, দুর্বল পরীক্ষাগার ব্যবস্থাপনা, ওষুধ প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতার অভাব এবং সর্বোপরি ওষুধ কোম্পানিগুলোর অনৈতিক প্রভাব ও দৌরাত্ম এ প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করছে। স্থানীয় পর্যায়ে ছোট কোম্পানিগুলো অধিকতর সমঝোতামূলক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। অপরদিকে ওষুধ প্রশাসন সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোতে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের প্রভাব সমঝোতামূলক দুর্নীতিকে আরও শক্তিশালী করছে।

অধ্যায়: ছয়
উপসংহার ও সুপারিশ

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর তার কাজের পরিধি, ভৌগোলিক আওতা এবং ওষুধের বাজারের বিস্তৃতি বিবেচনায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সক্ষম নয়। এক্ষেত্রে কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা যেমন- জনবল, অবকাঠামো, লজিস্টিকস এবং দক্ষতা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। এছাড়া ওষুধের বাজার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান আইনি কাঠামো সমসাময়িক বিষয় ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথেষ্ট নয় এবং বিদ্যমান আইনের কার্যকর প্রয়োগের অভাব রয়েছে। অপরদিকে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি রয়েছে। এক্ষেত্রে অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী দায়িত্ব বন্টন না করা, কর্মবণ্টনে স্বচ্ছতার ঘাটতি এবং কর্মকর্তাদের পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহিতায় ঘাটতি লক্ষণীয়। ওষুধ প্রশাসনের সেবা কার্যক্রমের প্রতিটি পর্যায়ে মূলত সমঝোতামূলক দুর্নীতির মাধ্যমে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে এবং স্থানীয় ছোট কোম্পানিগুলো অধিক মাত্রায় সমঝোতামূলক দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করছে। অপরদিকে ওষুধ প্রশাসন সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোতে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের প্রভাব সমঝোতামূলক দুর্নীতিকে শক্তিশালী করছে। সার্বিকভাবে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন সময়ে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে সদিচ্ছার ঘাটতি রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা বৃদ্ধিতে চাহিদা অনুযায়ী জনবল বৃদ্ধি না করা, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস সুবিধা না বাড়ানো, পর্যাপ্ত বরাদ্দ বৃদ্ধি না করা, ওষুধ নিয়ন্ত্রণে সমসাময়িক বিষয় ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইনি সংস্কার না করা উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ৬.১: ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণ

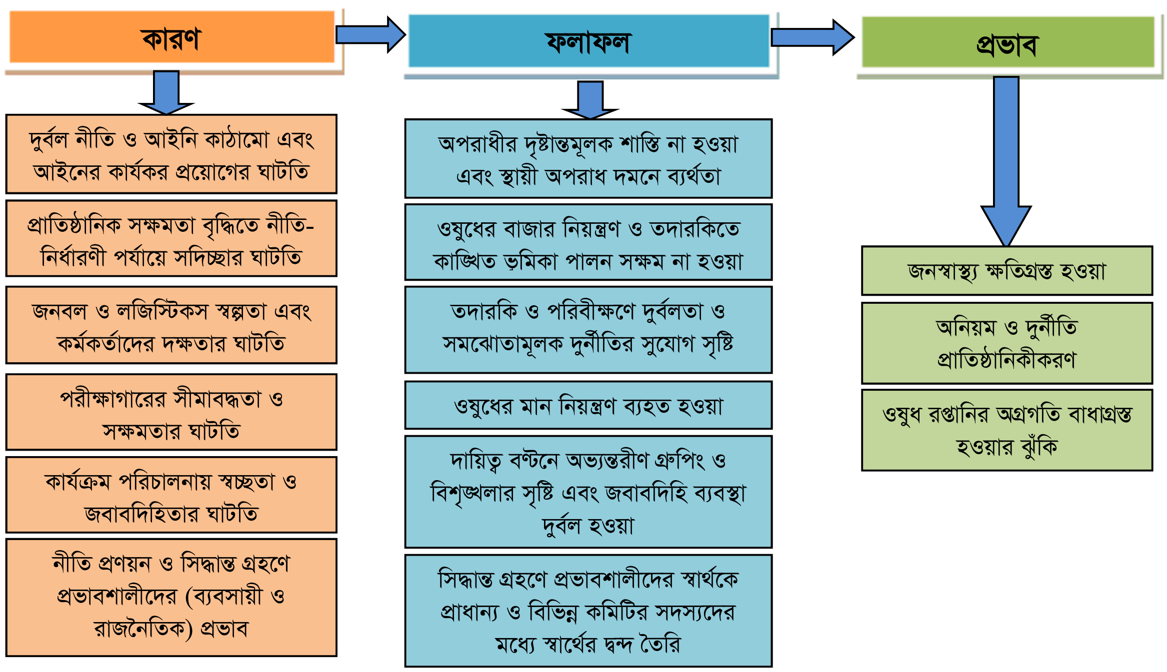

৬.১ সুপারিশ

এই গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ও তদারকি ব্যবস্থাপনাকে উন্নত ও টেকসইকরণ এবং দুর্নীতি ও অনিয়মরোধে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রণয়ন করছে-

আইন ও নীতি সংক্রান্ত

১. একটি যুগোপযোগী নীতি কাঠামো তৈরি এবং ওষুধ আইন ১৯৪০ ও ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এর নিম্নোক্ত সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় এনে একটি সমন্বিত একক আইন প্রণয়ন এবং এর কার্যকর প্রয়োগে পদক্ষেপ নিতে হবে

- আইনে মেডিকেল ডিভাইস, ফুড সাপ্লিমেন্ট ও কসমেটিকস সামগ্রী অন্তর্ভূক্ত করা

- ওষুধ সংক্রান্ত কমিটিগুলোর গঠন ও কর্ম প্রক্রিয়া আইনে অন্তভূক্ত ও সুনির্দিষ্ট করা
- ওষুধের মূল্য নির্ধারণে গেজেট প্রকাশের সময়কাল সুনির্দিষ্ট করা
- ওষুধ আইনে অপরাধের জরিমানা ও শাস্তির অসামঞ্জস্যতা দূর করে কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করা

প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত

২. কাজের পরিধি ও ভৌগলিক আওতা বিবেচণায় প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে একটি ওষুধ পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি ও অতিসত্ত্বর অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী সকল পর্যায়ে জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে

৩. প্রতিটি জেলায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অফিস স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস-আসবাবপত্র, কারিগরি সুবিধা এবং পরিদর্শনে পরিবহন সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে

৪. প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ করে কর্মীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে

৫. অর্গানোগ্রাম ও কর্ম-বিবরণ অনুযায়ী দায়িত্ব বণ্টন করতে হবে এবং ওষুধ কারখানা পরিবীক্ষণের দায়িত্ব বণ্টনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে

৬. অনলাইনভিত্তিক রিপোর্টিং চালু করতে হবে

৭. ওয়েবসাইটে সকল প্রকার রেজিস্ট্রেশনের তথ্যসহ অন্যান্য তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে

৮. ওষুধ কোম্পানিগুলোর ওয়ানস্টপ ও অনলাইন ভিত্তিক সেবা কার্যক্রম চালু করতে হবে

৯. ওষুধ প্রশাসনের কার্যক্রমে জন-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা- এ লক্ষ্যে টোল ফ্রি নম্বর বা হটলাইন চালু করতে হবে

অনিয়ম ও দুর্নীতিরোধ সংক্রান্ত

১০. ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতিরোধে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার ব্যবস্থা ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য নৈতিক আচরণ বিধি তৈরি ও বাস্তবায়ন করতে হবে

১১. ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোতে বিশেষতঃ ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কমিটি, মূল্য নির্ধারণ কমিটি, ব্লক লিস্ট অনুমোদন কমিটি এবং প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটিতে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের অর্ন্তভূক্তি বন্ধ করতে হবে

১২. যে সকল ওষুধ কোম্পানি নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ প্রস্তুত করে তাদেরকে চিহ্নিত করে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে

সহায়ক তথ্যসূত্র

প্রথম আলো, ২২ জুলাই, ২০১৪ "ভেজাল প্যারাসিটামল তৈরি, তিনজনের কারাদণ্ড"

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ আগস্ট, ২০১৪ 'শ্রমঘন শিল্পের মাধ্যমে দেড় কোটি কর্ম সংস্থানের সম্ভাবনা- বিশ্ব ব্যাংকের ৫ পরামর্শ-প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে টাস্কফোর্স

Chaitanya Chandra Halder and Emran Hossain, "Drug admin official couldn't care less" The Daily Star, August 07, 2014

Fattore G. Jommi C (1998) *"The new pharmaceutical policy in Italy"* Health policy; 46;21-41

Fuhr.T, Khan.N, Singh. N (2013) "Evolving *Beyond Global Regulators"* Mckinsey Center for Government; Mckeinsey & Company; www.mckinsey.com/mcg

Food and Drug Administration(2000) Office of Women's Health, FDA Milestones in Women's Health: Looking Back as We Move into the New Millennium (FDA, Rockville, MD,2000), www.fda.gov/womens/milesbro.html.

Food and Drug Administration; Center for Drug Evaluation and Research, *Time Line: Chronology of Drug Regulation in the United States* (FDA, Rockville, MD), www.fda.gov/cder/about/history/time1.htm.

Food and Drug Administration (1995) "Milestones in US Food and Drug Law History," in FDA Backgrounder: Current and Useful Information from the Food and Drug Administration (FDA, Rockville, MD, August 1995), www.fda.gov/opacom/backgrounders/miles.html.

Food and Drug Administration (2000) Code of Federal Regulations, Title 21, Food and Drugs, "Current GoodManufacturing Practice in Manufacturing, Processing, Packing, orHolding of Drugs," Part 210–211 (US Printing Office, Washington, DC, revised April 2000).

Gregg. C and Vexkull.E, (2011) "Skills for Trade and Economic Diversification (STED) in Bangladesh: The case of Pharmaceuticals and Agro-Food" ISBN: 9789221259305, ILO

Hill.S and Johnson.K (2004) "Emerging Challenges and Opportunities in Drug Registration and Regulation in Developing Countries" DFID Health Systems Resources Centre.

Habib. A and Alam. Z(2011) " Business Analysis of Pharmaceutical Firms in Bangladesh : Problems and prospects" Journal of Business and Technology (Dhaka)

Islam MS. (2008) "Therapeutic drug use in Bangladesh: policy versus practice", Indian Journal of Medical Ethics

Immel. B (2001) “A brief History of the GMPs for Pharmaceuticals” Pharmaceutical Technology. www.pharmaproduct.com

J,-d. Rainhorn, P.Brudon- Jakobowicz, & M.R. Reich (1994) “Priorities for pharmaceutical policies in developing countries: results of a Delphi survey” Bulletin of the World Health Organization, 1994.72(2): 257-264, WHO 1994

Mahbuba Jannat. *Drug Administration in dwindling state*, The Daily Star, 19 September 2007

Ratanawijitrasin.S and Wondemagegnehu.E (2002) “Efective drug regulation; A multry country study” ISBN 92 4 156206 4, WHO

Rudolf PM, Bernstein IBG (2004) “*Counterfiet drugs”* New Engl J; 350(14): 1384

Smine A, Phouvong S, Chanthap L, Tsuyoka R, Nivana N(2004). “Antimalarial drug control in Mekong Countries” ICIUM, Thailand

S.K Safwan (2012) *“An overview of the pharmaceutical sector in Bangladesh”,* BRAC EPL

Policy Research Institute (PRI) of Bangladesh, October 2013 “Input-output sectoral survey report: Pharmaceuticals (Vol 6)”

World Bank (2007), *“Improving the Competitiveness of the Pharmaceutical Sector in Bangladesh”* Policy Note

World Health Organization, *The Rational Use of Drugs, Report of the Conference of Experts*, Geneva; WHO; 1985

World Health Organization (2002), Promoting rational use of medicines: core components, WHO Policy Perspectives on Medicines

http://www.who.int/medicines/library/par/who-2003-9/who_edm_par_20039.pdf. accessed on 24 august 2014

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

এমরান. শা (২০০৯) ''ফার্মেসী ফার্মসিউটিক্যাল সেক্টর ও স্বাস্থ্যসেবা", শোভা প্রকাশ, ঢাকা

Amran.S (2010) " *Introduction to Pharmacy*", krishnochura Prokashoni, Dhaka

Bains.A (2010) *" Problems Facing the Pharmaceutical Industry and Approces to Enshure Long term Viability"* University of Pennysylvania.

Chowdhury Z.(1995) "The Politics of Essential Drugs" Zed Books Ltd, London and New
Jersey,

Chetley A.(1990) *"A Healthy Business*". Zed Book Ltd, London and New Jersey,

Deutsche Gesellschaft Fur. " Study on the Viability of High Quality Drugs Manufacturing in Bangladesh" http://www.giz.dc

Dunlop DM, Dentson TC (1958). "The History and Development of the British Pharmacopoeia". Br Med J.; 1250-2.

Hye HKMA. (1986) "Action Programme on Essential Drugs; The Bangladesh Experience", in N Islam and SAR Choudhury, Proceedings of Conference on Essential Drugs in Primary Health Care, held onFebruary 4-9, , sponsored by IPGMR & WHO, pp-68-77.

Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW). Circular memo no. Public Health-1/Drug 18/93/63, dated 26/02/94, Directorate of Drug Administration, Bangladesh Gazette, dated May 5th 2005, National Drug Bangladesh.

M Babu. (2007) "Factors contributing to the purchase of Over The Counter (OTC) drugs in Bangladesh: An Empirical study". The Internet Journal of Third World Medicine. Volume 6 Number 2.

Nazia S, Rahman MS. (2011) "Drug Regulatory Policies, Drug Price and Drug Use Patte BangladeshPerspective." Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University; Dhaka

National Drug Policy 2005, Government of People's Republic of Bangladesh Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW). Bangladesh Gazette, dated May 5th 2005, National Drug Policy 2005, Government of People's Republic of Bangladesh. Hye HKMA. Ten years of Bangladesh Drug Policy, April 1992.

National Drug Policy of Bangladesh, 1982 Government of the Peoples Republic of Bangladesh, Directorate of Drug Administration, Ministry of Health & Population Control, March, 1986, Drug Admin. Publication No: 2

Ullah M. (1985) “Drug Policy: Confounded debate/A Review of the Bangladesh Drug Policy”.Health for All. Dhaka.

World Health Organization “Managing drug supply” Double Issue-N◦ 25 & 26 (1998)- Essential Drugs Monitoring

World Health Organization (1988) “How to develop and Implement a national drug policy” second edition, Updated and replaces Guidelines for Developing National Drug Policies